Contents

উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতিমীয়দের ইতিহাস

এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

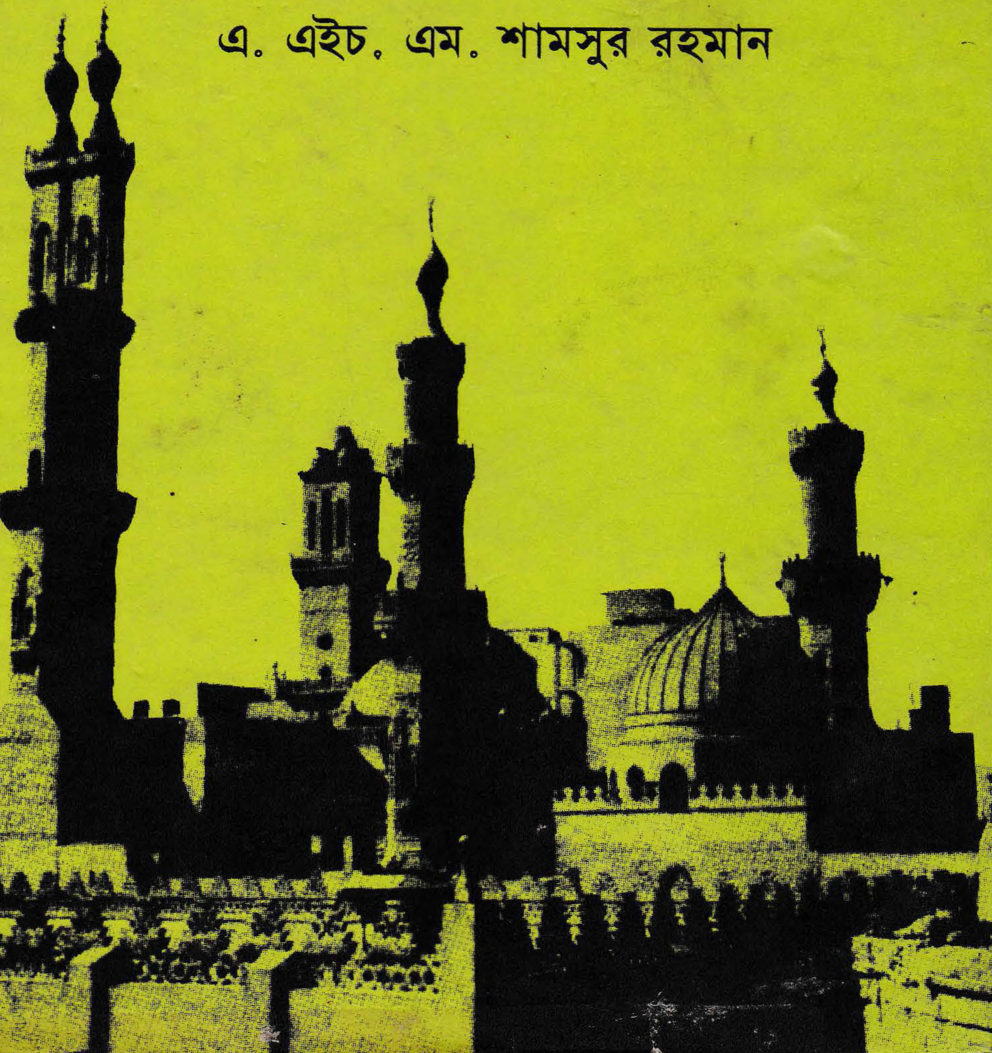

উত্তর আফ্রিকা
ও
মিশরে ফাতিমীয়দের ইতিহাস

www.waytojannah.com

Contents

উত্তর আফ্রিকা
ও
মিশরে ফাতিমীয়দের ইতিহাস

এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান
বি. এ (অনার্স); এম. এ
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
বিভাগ, সরকারী বি. এল. কলেজ দৌলতপুর, খুলনা।
প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারী কলেজ,
মেহেরপুর, প্রভাষক, সরকারী এম. সি.
কলেজ, সিলেট এবং অধ্যাপক,
মতলব ডিগ্রী কলেজ, চাঁদপুর,
কুমিল্লা।

স্টুডেন্ট ওয়েজ
বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.waytojannah.com

প্রকাশনার চার দশকে
ষ্টুডেন্ট ওয়েজ

প্রকাশক
মোহাম্মদ লিয়াকতউল্লাহ
ষ্টুডেন্ট ওয়েজ
৯ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
দূরাভাষ ঃ ২৫১ ০৩৭

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০০ সাল
মহরম ১৪১৪ হিঃ.

প্রচ্ছদ
মিশরের আল আজহার
মসজিদের ছবি থেকে পরিকল্পিত

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

অক্ষর বিন্যাস
দশদিশা কম্পিউটার
২১ শান্তিনগর ঢাকা

মুদ্রণে
সালমানী প্রিন্টার্স
নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য
নিউজ-পঞ্চাশ টাকা
সাদা-পচাত্তর টাকা

ISBN- 984-406-050-8

UTTOR AFRIKA O MESOREAR FATIMIYODHER ITIHAS: (A History of South Afrika and Fatimiyian in Egypt) by A. H. M. Shamsur Rahman. Published by Mohammad Liaquatullah of Student Ways. 9, Bangla Bazar, Dhaka-1100. First Edition, June Nineteen hundred Ninety three. Price : White : Taka Seventy five News : Fifty only.

www.waytojannah.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

উত্তর আফ্রিকায় ও মিশরে ফাতিমীয়দের রাজ্য শাসনের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক। আব্বাসীয় খিলাফতের আঙ্গিনায় শিয়ামতবাদ পুষ্ঠ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় এক দৃষ্টি আকর্ষণীয় ব্যাপার। প্রায় পৌনে তিন শ' বছর পর্যন্ত নিজস্ব ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য, শিল্প সাহিত্য, স্থাপত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে ফাতিমীয়গন উত্তর আফ্রিকা, মিশর, সিরিয়া, এমন কি কিছু সময়ের জন্য মক্কা মদীনা পর্যন্ত খুত্বা ও মুদ্রা নিয়ে গৌরবের পতাকা সমুন্নত রাখে। তবে এই বিস্তৃত সময়ের ইতিহাস বিদেশী ভাষায় লেখা বইগুলি আমাদের দেশে অধিকাংশই সহজলভ্য নয়। আরবী ও ইংরাজিতে লেখা যে বইগুলি পাওয়া যায় তাও হালে ছাত্রদের পাঠ অভ্যাস বহির্ভূত।

তাই মাতৃভাষা বাংলায় ইতিহাস চাই–এ দাবী। কিন্তু প্রয়োজনীয় উপুকরণে যথাযথ তথ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা খুবই শ্রম সাধ্য। চাহিদা মুতাবিক প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ দুর্লভ। আমাদের দেশে যতদিন না পাশ্চাত্যের গ্রন্থাগারের ন্যায় দুস্প্রাপ্য গ্রন্থরত্ন ভান্ডার গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হবে ততদিন জ্ঞানের দৈন্যতা রয়েই যাবে। তবু অনেক সাধের পিয়াস সীমিত সাধ্যে নিবারনের জন্য এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। ইতিহাস জানার কৌতুহল সৃষ্টি করে পাঠকের সামনে অতীতকে তুলে ধরার যে প্রচেষ্টা তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মহলে সহযোগিতা সর্বদাই স্মরণীয়।

স্বল্প পরিসরে কেবল রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এ বইটিতে। কলেবর বৃদ্ধি পাবে অন্যান্য আলোচনায় এ ইচ্ছা রইল আগামীতে। যে কোন ধরনের প্রমাদ পাঠকের দৃষ্টিতে এলে অবহিত করার অনুরোধ রইল। ষ্টুডেন্ট ওয়েজ বইটি মেহেরবানী করে প্রকাশ করায় তাকে সহ মুদ্রণ ও বাধাইয়ে যারা সহযোগী তাদেরকেও জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তবে বইখানি যাদের জন্য লেখা তাদের চাহিদা পূরণ হলেই শ্রম স্বার্থক হবে।

সকল ও শেষ প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাওয়া তায়ালার যার অনুগ্রহ ও রহমত ব্যতীত বইটি ছাপার জগতে আসতো না। শোকর ও ছুজুদ তারই।

এ, এইচ, এম, শামসুর রহমান

দৌলতপুর
২৮, ৬, ৯৩

www.waytojannah.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতিমীয়দের ইতিহাস–৯, হযরত আলীর বংশ তালিকা–১৬, ইসমাইলীয় সম্প্রদায়–১৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খলিফা উবায়দুল্লাহ আল মাহদী–২৪, কারমাতীয়–২৪ উবায়দুল্লাহ আল মাহদীর কার্যক্রম–২৬, উত্তর আফ্রিকায় বার্বার গোত্র–২৭, আল মাহদীর কৃতিত্ব–২৮, মিশরে ১মঅভিযান–২৯, মিশরে ২য় অভিযান–২৯।

তৃতীয় অধ্যায়

আবুল কাসিম মুহম্মদ নিযার আল কাইয়িম বি আমর আল্লাহ–৩৩।

চতুর্থ অধ্যায়

আবু তাহির ইসমাইল আল মনসুর বি আমর আল্লাহ–৩৫।

পঞ্চম অধ্যায়

আবু তামিম মা আদ আল মুইজ লি–দীন–আল্লাহ–৩৭, স্পেনের শাসকের সাথে মুইজের সংঘর্ষ–৩৯, ক্রীট–৪০, সিসিলি–৪০, মিশর বিজয়ের পটভূমি–৪১, মিশর অভিযান–৪৩, জাওহারের অন্যান্য কাজ–৪৪, কারমাতীয়দের সাথে সংঘর্ষ–৪৬, আল মুইজের মিশর আগমণ–৪৭, কারমাতীয়দের পুনঃআক্রমণ–৪৮, হাফতকীনের সাথে সংঘর্ষ–৪৮, আল মুইজের শাসন ব্যবস্থা–৪৯, বিচার–৫০, অর্থনৈতিক অবস্থা–৫০, উজির–৫১, সাহিব আল সুরতাহ–৫১, দাওয়া বিভাগ–৫১, আল মুইজের সাংস্কৃতিকবিজয়–৫২।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল ইমাম নিজার আবু মানসুর আল আজিজ বিল্লাহ–৫৩, সিরিয়া–৫৪, খলিফা আল আজিজের শাসন ব্যবস্থা–৫৫, কাযী–৫৭, খলিফার মৃত্যু–৫৭ কৃতিত্ব–৫৮।

www.waytojannah.com

সপ্তম অধ্যায়
আল মনসুর আবু আলী হাকিম বি আমরিল্লাহ–৫৯, আবু রাকওয়ার বিদ্রোহ–৬২, দারাজী বা দ্রুজেস–৬৪, স্থাপত্য কীর্তি–৬৬, দারুল হিকমা–৬৬, দাওয়া বিভাগ–৬৭, আহমদ হামিদুদ্দীন কিরমানী–৬৭, কৃতিত্ব–৬৮।

অষ্টম অধ্যায়
আবুল হাসান আলী আজ জাহির–লী–ইজাজী–দীনিল্লাহ–৬৯

নবম অধ্যায়
আবু তামিন আল মুসতানসির বিল্লাহ–৭২, বদর আল জামালী–৭৫, নসির–ই–খসরু–৭৭, মুয়াইদ ফী দীন আশ শীরাজী–৭৮, কারমাতীয় আন্দোলন–৭৯, হাসান বিনসাববাহ–৮০।

দশম অধ্যায়
আবু কাশিম আহমদ আল মুসতালী–৮১

একাদশ অধ্যায়
আবু আলী আল মনসুর আল আমীর–বি–আহকামিল্লাহ–৮৫।

দ্বাদশ অধ্যায়
আবুল মায়মুন আব্দুল হামিদ আল হাফিজ লী–দী–নিল্লাহ–৮৮।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
আবু মনসুর ইসমাইল আজ জাক্কিরলি, আদাই দীনিল্লাহ–৯০।

চতুর্দশ অধ্যায়
আবুল কাসিম ঈসা আল ফাইজ–বি–নাসরিল্লাহ–৯২।

পঞ্চদশ অধ্যায়
আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল আদীদ–৯৩, ফাতিমীয় খিলাফতের কেন পতন ঘটলো–৯৬, ফাতিমীয়দের পতনের যুগ–১০১, ফাতিমীয়দের বংশ তালিকা–১০২, ফাতিমীয় খলিফা–১০২, মিশরের শাসন কর্তাবৃন্দ যুগে যুগে–১০৪, গ্রন্থপুঞ্জি–১০৮।

www.waytojannah.com

প্রথম অধ্যায়

উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতিমীয়দের ইতিহাস

ইসলাম এক ও অভিন্ন সৃষ্টির প্রথম থেকেই। আলকুরআন ঘোষণা করছেঃ– "এবং তোমাদের এই যে জাতি এ তো একই জাতি আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমাকে ভয় কর। কিন্তু মানুষ নিজেদের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। সুতরাং ওদের বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও কিছু–কালের জন্য।" সুরা মু'মেনূনঃ ৫২–৫৪।
নিশ্চয়ই যারা দ্বীনকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।। সুরা আনআমঃ ১৫৯
তোমরা সমবেতভাবে সুদৃঢ় মুষ্টিতে আল্লাহ্‌র রশিকে আঁকড়ে ধর, দলে দলে বিভক্ত হইও না। সুরা আলে ইমরানঃ ১০৩।
Islam appears first on the page of history as a purely Arab religion: indeed it is perfectly clear that the prophet Mohammad, whilst intending it to be the one and only religion of the whole Arab race, did not contemplate its extemsion to foreign Communities. "Throughout the land there shall be no second creed" was the prophet's message from his death bed and this was the guiding principle in the policy of the early khalifs. [১]
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তৎকালীন আরব জনসমাজকে এমন একটি জীবন উপহার দিয়েছিলেন যা ছিল তাদের অকল্পিত এবং অভাবিত অথচ আকাঙ্ক্ষিত। সমাজ জীবনের সংঘাত, নারীর অবমাননা, ব্যভিচার, যৌন অপরাধ, মদ জুয়ার দুঃসহ বেদনাক্লিষ্ট দীর্ঘ আরব জীবন ইসলামের বিপ্লবী সমাজব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। পরিশীলিত ও শুদ্ধ জীবনে ফিরে আসে স্বস্তি, নিরাপত্তা ও শান্তি। নারী–পুরুষ আশা–আকাঙ্ক্ষায় এমন একটা জীবনের স্পর্শ পেল যা সম্মান, সম্ভ্রম ও স্বস্ব অধিকারপুষ্ট। জীবনের এ বাঞ্ছিত বার্তা আরবের বাইরে ভাগ্যাহত মজলুম জনতার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তারা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় রইল। ১১ হিজরীর শুরুতেই বিশ্বনবীর (সঃ) ইন্তিকাল হয় এবং দশ বছরের মধ্যেই ইসলামের মহান খলিফাগণ মহানবী (সঃ)র প্রতিষ্ঠিত দ্বীনকে, তাঁর সমাজ দর্শনকে, অর্থনৈতিক মুক্তির পয়গামকে, সংস্কৃতি সভ্যতার বাণীকে ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আরব সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে দিল মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া এবং পারস্যভূমিতে। শক্তিশালী রোমান ও পারসিয়ান সাম্রাজ্য আরব বিজেতাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করল। ইসলামের বিজয়ী

১. De lacy O'Leary D. D. A short History of the fatimid Khalifats P-1 (London. 1923)

www.waytojannah.com

পতাকা এশিয়া আফ্রিকা পার হয়ে ইউরোপেও পৌছাল। হিজরীর প্রথম শতকেই তিন মহাদেশব্যাপী ইসলামী শাসন সু প্রতিষ্ঠিত।

এই সময়ে গ্রীক সভ্যতার, হেলেনিক সভ্যতার ও পারসিক সভ্যতার উত্তরসূরী বহুসংখ্যক মানুষই ইসলামের ছায়াতলে। সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে আরবরা বেশ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। শুধু সংখ্যা নয়, তাদের দর্শন ভাব ভাষা এবং সংস্কৃতির মিশ্র বিকাশ শুরু হয় ইসলামের তাঁবুর মধ্যে বসবাস করেই। আরব–অনারব সমাজ নৃতত্ত্বে মিশ্রণ ঘটে। ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে নিখুঁত আরব দর্শন যেন ধাক্কা খেতে শুরু করল। O'Leary সাহেব অত্যন্ত দূরদৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে ..... within the first century of the Hijra the Arabs themselves were in a numerical minority in the church of Islam. The alien converts, socially and intellectually developed in the culture of the Hellenistic world or of semi Hellenistic Persia. [১]

ফলে চিন্তার লাগামহীন স্বাধীনতা, কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার বেপরওয়া প্রবাহ নব্য অনারব মুসলিমকে উৎসাহিত করল নানা পথ ও মতের অন্বেষায়। ভাববাদী, যুক্তিবাদী, উগ্রবাদী; মরমীবাদী, সূক্ষ্মতত্ত্ববাদী প্রভৃতি দর্শন এক ও অবিভাজ্য ইসলামকে যেন মিরাসীসূত্রে ভাগ বাঁটোয়ারায় মেতে উঠল। রাষ্ট্র, ধর্ম, দর্শন, সমাজ, অর্থনীতি ইবাদৎ বন্দেগী প্রভৃতি জীবনের পরিশুদ্ধ রূপটাই ইসলামের। মহানবী (সঃ) এটাই সংগ্রামী জীবন দিয়ে জগৎবাসীকে উপহার দিয়েছেন। খণ্ডিত কোন রূপও তার স্বাতন্ত্র্য একক জীবন দর্পণে ছিল না। রোমান বা পারশিয়ান রাষ্ট্রে রাজ্য শাসন যে করত ধর্মযাজক সে নয়। অর্থনীতি নিয়ে যে থাকত, দর্শন তার নয়। এমনি একটি লৌকিক ও ধর্মীয় বিভাজন জীবনের রূপ ছিল, যা খ্রীষ্টান সমাজেও লক্ষ্যণীয়। পোপ বা পাদরী নিশ্চয় রাজদণ্ড হাতে নেবে না আর রাজাও গীর্জার বেদীতে উপবিষ্ট নয় যেমন অর্থনীতিবিদ বা সমরনায়কও সেখানে আসন নেবে না। সকলের ক্ষেত্র চিহ্নিত নির্দিষ্ট এবং একে অন্যের সীমানায় যেতে মানা। এ বিভাজন জীবন কিন্তু ইসলামে নেই। গভীর নিশীথের আঁধার ভেদ করে সুপ্ত নিদ্রিত ধরণীর নিস্তব্ধতায় যিনি প্রভুর ইবাদতে তন্ময়–তার সাহায্য কামনায় অশ্রুসিক্ত নয়নে সকাতর প্রার্থনায় আত্মবিস্মৃত, ঠিক সেই মানুষটিই প্রভাতে তলোয়ার হাতে মজলুম জনতাকে জালেমের হাত হতে মুক্তির জন্য রণক্ষেত্রে আপোষহীন সংগ্রামে দেহের তাজা রক্ত ঝরাতে দৃপ্ত শপথে উদ্যত। আবার তিনি দরিদ্রের বোঝা নামাতে, এতিমের মাথার বোঝা সরাতে ও ধনীর বিত্ত হতে অর্থ সংগ্রহে তৎপর। বিচারের আসনে যেমন তিনি, বক্তৃতার মঞ্চেও তিনি, অথচ একটি রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক তিনি। তাহলে মুসলিমের জীবন তো ভাগ ভাগ করে নেবার নয়। কর্মে তিনি মহান, বর্ণে নয়, নয় বংশে। বংশীয় কৌলিন্য ও পৌরহিত্য করার দুর্দমনীয় মোহ অভিজাতকে করে তোলে বেপরওয়া। ফলে বংশ নিয়েই তার গর্ব ও অহঙ্কার। এটা কুরাইশদের ছিল আইয়্যামে জাহিলিয়াতে। কিন্তু মহানবী (সঃ) আল–কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন–"তোমরা এক নরনারী হতে সৃষ্ট, গোত্রে বিভক্ত পরিচিতির জন্য, তবে আল্লাহ্‌র নিকট সে–ই সম্মানিত, যে তার কর্মে স্রষ্টার অনুগত।" তিনি স্বয়ং

---

১. Delacy O'leary P-2

বলেনঃ- আরব অনারবের উপর যেমন শ্রেষ্ঠত্ব নেই তেমনি কৃষ্ণবর্ণের উপর গৌরবর্ণেরও শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

অথচ বংশের কারণেই একটা দলের আবির্ভাব ঘটল। এর ইতিহাস বা মূল সূত্র কোথায় সেটা অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

পারসিয়ানরা বিশ্বাস করত-রাজতন্ত্রের বংশানুক্রমিক ধারা। কেননা একজন রাজার মৃত্যু হলে তাঁর স্বর্গীয় আত্মা পরবর্তী রাজার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। আর এর পিছনে ঐশ্বরিক সমর্থন বিদ্যমান।

★ O'Leary সাহেব বলেন-"The kingship as hereditary in the sense that the semi-divine kingly soul passed by transmigration at the death of one sovereign to the body of his divinely appointed successor. This had been the Persian belief with regard to the sasanid kings. and the Persians fully accepted yazdegird, the last of these, as a re-incarnation of the princes of the semi-mythical kayani dynasty to which they attributed their racial origin and their culture. [১]

ইয়াজদিজির্দ (৩য়) ৩১ হিজরীতে (৬৫২) মারা গেলে পারসিকদের পুরুষ শাসনের সমাপ্তি ঘটে। এটা জনসাধারণের একটা বিশ্বাস যে, তার কন্যা শাহার বানুর সাথে হযরত আলী (রাঃ)র পুত্র হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে পারসিক ভাবধারার বংশীয় কৌলিন্যের এক নবতর সংস্করণ সংক্রামিত হয়। পারসিকদের জন্য একটা কোমল অন্তর হযরত আলী (রাঃ)-র বংশে সযত্নে লালিত হবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অনারব পারসিয়ানদের ইসলামী ভ্রাতৃত্বে একটা সাম্য মৈত্রীর স্থান করে দেবার বিষয়ে বরাবরই হযরত আলী সোচ্চার ছিলেন। হযরত আলীর (রাঃ) সাথে হযরত মোআবিয়ার (রাঃ) সংঘর্ষের পর পারসিয়ানরা ন্যায়সঙ্গত কারণে মুআবিয়া-বিরোধী হয়ে যায়। তারা উমাইয়া খিলাফতে দারুণভাবে নিগৃহীত হয়। বৈষম্যের শিকারে তারা অধিকার-বঞ্চিত শ্রেণীতে পড়লে আহলে হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন তাদের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ফলে পারসিকদের সাথে আহলে আলীর (রাঃ) সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। পারসিকদের পুরাতন ধর্মবিশ্বাস যেন আলীর (রাঃ) বংশের প্রতি আরোপিত হতে থাকে। 'আত্মার দেহান্তর পরবর্তী পুরুষে'— এটাই ইসলাম বিরোধী হলেও আলী-ভক্ত পারসিকদের বিশ্বাসের ব্যাপারটি প্রস্তরীভূত হয়ে পড়ে। অতিইন্দ্রিয়বাদ, ভক্তিবাদ, অলৌকিকত্ববাদ—সবই পারসিক হলেও পারসিক নও-মুসলিম মাওয়ালীরা এটা ছাড়েনি তো বটেই, উপরন্তু এটাকে ইসলামী করে নতুন প্রজন্মে ধর্মবিশ্বাসের মন্ত্ররূপে বিধিবদ্ধ করল। ফলে হযরত আলীর ভক্তদের এটা বিশ্বাস করতে আর কষ্ট হোল না যে, "যেহেতু তিনি বিশ্বনবীর (সঃ) চাচাত ভাই আর জামাই এবং বিশ্বনবীর জীবিত পুত্র ছিল না আর একমাত্র কন্যা ফাতিমাই জীবিত ছিলেন— ফলে ফাতিমাই মহানবীর (সঃ) উত্তরাধিকারিণী এবং জামাই হযরত আলীই খিলাফতের যোগ্য ও বৈধ দাবীদার, অন্য তিনজন খলিফা খিলাফতের আত্মসাৎকারী।" মহানবী (সঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, নবীদের ওয়ারেশ বা উত্তরাধিকারী মুসলিম উম্মাহ। তারা যাকে খিলাফাতে নির্বাচিত করবে তারাই তার উত্তরাধিকারী।

১ De Lacy O'Leary, P-3

www.waytojannah.com

তাই মহানবীর (সঃ) বাণী অনুযায়ী হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী (রাঃ) জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত খলিফা। এটাই সমগ্র মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস ও স্বীকৃতি। হযরত আলী (রাঃ) কখনও তার তিনজন পূর্বসূরীর বিরোধিতা করেননি বরং তাঁদের সময়ে তাঁদের সহযোগী হয়ে মুসলিম শাসনের উল্লেখযোগ্য খিদমত করেছেন।

পারসিক চিন্তাধারার প্রভাবে ইমামত বা রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারিত্ব পরবর্তী রাজা বা ইমামের মধ্যে স্বর্গীয় আত্মার প্রবেশ এবং তা ক্রমাগতভাবে বংশানুক্রমিক চলতে থাকবে এটাই ফাতিমার বংশধরগণ সযত্নে ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গরূপে অত্যাবশ্যক মনে করেন। অথচ এমন যে কোন বিশ্বাস ইসলামের মৌলিক আকিদার পরিপন্থী। ইমামত বা ঐশ্বরিক নেতৃত্ব ইসলামে নতুন আবিষ্কার। হযরত উসমান (রাঃ)–এর রাজত্বকালে ৩২ হিজরীতে ইয়েমেনের আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হলেও তার পূর্ব ধারণা, যা ইয়েমেনে প্রথাগতভাবে প্রচলিত ছিল যে, স্বর্গীয় নেতৃত্ব ব্যতীত জনগণের কল্যাণ আসে না, এটার প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠল এবং হযরত আলীই Divine leadership-এর জন্য মনোনীত।

হযরত ওসমান (রাঃ)–এর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর হযরত আলী (রাঃ) খলিফা হন। কিন্তু তাঁর অনুমোদন ছাড়া ঐ স্বর্গীয় নেতৃত্ব তাঁর প্রতি আরোপিত হতে থাকে বিশেষ করে নও–মুসলিমদের দ্বারাই। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হযরত আলী (রাঃ) আততায়ীর হাতে ৪০ হিজরীতে নিহত হবার পর ঐ অতিভক্তের দল প্রচার করল, হযরত আলীর বিদেহী আত্মা আকাশের মেঘমালায় ঠাঁই নিয়েছে, তার কণ্ঠ মেঘের গর্জনে শ্রুত হয়, তাঁর উপস্থিতি বিদ্যুতের চমকে দৃশ্য হয়। প্রয়োজনীয় সময়ে আবার তিনি পৃথিবীতে আসবেন। ইত্যবসরে তাঁর পবিত্র আত্মা পরবর্তী ইমামদের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করবে উত্তরাধিকারসূত্রে। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র হযরত হাসান খলিফা হন কিন্তু হযরত মুআবিয়ার সাথে এক সমঝোতায় খিলাফতের দায়িত্বভার ত্যাগ করেন। কিন্তু আলী–ভক্তের দল এটাও গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করেন না।

কারবালার নৃশংস হত্যাকাণ্ড ছিল ইসলাম জগতে এক বেদনাবিধুর ঘটনা। এটা সকল মুসলমানের জন্য শোকাবহ ঘটনা। সকলেই এজন্য ঘটনার সঙ্গে জড়িতের নিন্দা আর ধিক্কার প্রদানে আদৌ কার্পণ্য করে না। হযরত হোসাইনের (রাঃ) হত্যা নতুনভাবে আলীপন্থীদের অনুপ্রাণিত করে। এ ঘটনা এমন একটা আবেগ সৃষ্টি করে, যা ধর্মীয় উন্মাদনায় অনেক নতুন কিছুর জন্ম দেয়। শিয়া শব্দের অর্থ দল। এখানে শিয়া অর্থে হযরত আলীর দলকে বোঝায়, যদিও তিনি নিজে এমন কোন নির্দিষ্ট দলের প্রতিষ্ঠা করেননি. কারবালার পর এ দলের পৃথক সত্তা সরাসরিভাবে প্রকাশ ঘটে।

হযরত হোসাইনের মৃত্যুর পর তিনটি ধারা আলী বংশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। ১, যারা হযরত হাসান থেকে ২. যারা হযরত হোসাইন থেকে তারা উভয়ে হযরত আলী ও হযরত ফাতিমার সূত্রে নবী (সঃ)-এর নিকটতম আত্মীয় এবং উত্তরাধিকারী কেননা মহানবী (সঃ)-এর কোন জীবিত পুত্রসন্তান ছিল না ৩. মুহম্মাদ আল হানাফিয়া—হযরত আলীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান থেকে।

www.waytojannah.com

প্রথমতঃ হযরত হাসানের বংশধরেরা হিজরত করে মাগরিবে (মরক্কো) যায় এবং সেখানে ইদ্রিসীয় বংশের সূচনা করে। মরক্কোর শরীফরাও এই বংশের। তারা শিয়াদের একটা নমনীয় দলই বলা যায়। তাদের মতবাদ প্রায় সুন্নীদের ন্যায়। এশীয় শিয়াদের ন্যায় পারসিক প্রভাবিত কোন বৈদেশিক প্রথা বা আইনে তারা বিশ্বাসী নয়। এখানে একটা কথা বলা ভাল যে, সুন্নী কারা? বিশ্বনবীর (সঃ) নবুওয়াত ও রিসালাতে যারা অকুণ্ঠ বিশ্বাসী, তাঁর কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনভিত্তিক বিশুদ্ধ হাদিসে যারা বিশ্বাসী, যারা তাঁর ব্যবহারিক জীবন নিজেদের জন্য অনুকরণীয় বলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, যারা কুরআন ও হাদিসে অস্পষ্ট কিছু নেই, সবই সকল মুসলমানের জন্য মহানবী (সঃ) স্পষ্ট করে বলে গেছেন, যারা বিশ্বনবীর (সঃ) মৃত্যুর পর তাঁরই আদর্শে নিবেদিত চারজন খলিফা—যথা হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে পরপর খিলাফাতের বৈধ অধিকারী, কেউ কাউকে বঞ্চিত করে ক্ষমতা দখল করেননি বরং সকলেই জনগণের ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং কুরআন হাদিসের ধারক বাহক হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন বলে বিশ্বাস করে তারাই সুন্নী।

সর্বপ্রথম যে দলটি আলীবংশের পতাকা নিয়ে প্রকাশিত হল, তারা হল মুহাম্মদ আল হানাফীয়ার। হযরত আলীর (রাঃ) মুক্তদাস কাইসান হযরত হাসান ও হযরত হোসাইনের রক্তের বদলা গ্রহণের জন্য জনগণকে সংগঠিত করে। তারা চারজন ইমাম বা নেতাকে স্বীকৃতি দেয়। হযরত আলী, হযরত হাসান, হযরত হোসাইন ও মোহাম্মদ হলেন সেই চারজন বৈধ ইমাম। তাদের দাবী হোসাইনের মৃত্যুর পর ইসলাম জগতে মোহাম্মাদ আল হানাফিয়াহ্ আইনতঃ খলিফা এবং স্বর্গীয় মনোনীত ইমাম। অবশ্য মুহাম্মাদের জীবদ্দশায় তাঁর ভক্তদের এহেন কার্যকলাপকে তিনি স্বীকৃতি দেননি। ৮১ হিজরীতে তাঁর মৃত্যুর পর কাইসানীয়গণ কাইসানের পুত্র আবু হাশিমকে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করে। ৯৮ হিজরীতে পুত্রহীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর দল মুহম্মদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ্ (মৃঃ ১২৬ হিঃ)-কে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করে, যদিও তিনি আলীবংশীয় নন। মূলতঃ এই শাখাই পরবর্তীকালে আব্বাসীয় বংশ হিসাবে ১৩২ হিজরীতে বাগদাদে নতুন খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত করে।

শিয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দলটি হল যারা ইমাম হোসাইনকে তৃতীয় ইমাম হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাঁর পুত্র আলী জয়নুল আবেদীন (মৃঃ ৯৪ হিঃ)-কে পরবর্তী উত্তরাধিকারী ইমামরূপে স্বীকৃতি দেয়। পারস্যের রাজকীয় পরিবারের রাজকন্যা শাহার বানুর গর্ভজাত সন্তান-ই জয়নুল আবেদীন।

ইমাম জয়নুল আবেদীনের মৃত্যুর পর এই দল দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল তাঁর পুত্র জায়েদকে (মৃঃ ১২১হিঃ) এবং অন্যদল তাঁর অন্য পুত্র মুহাম্মাদ আল বাকেরকে (মৃঃ ১১৩ হিঃ) ইমামরূপে গ্রহণ করে। ইমাম জায়েদের নামানুসারে জায়েদীয়া দল কিছু সময় ধরে উত্তর পারস্যে এবং পরে দক্ষিণ আরবে তাদের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকে। জায়েদ ওয়াসিল বিন আতা, যিনি মুতাযিলা ছিলেন, তাঁর বন্ধু ও শিষ্য ছিলেন এবং মুক্ত চিন্তার অধিকারী হিসাবে পরিচিত হন।

www.waytojannah.com

শিয়াদের মধ্যে অধিকাংশই মুহাম্মাদ আল বাকেরকে ৫ম ইমামরূপে স্বীকৃতি দেয়। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র জাফর আস সাদেক (মৃঃ ১৪৮ হিঃ) ৬ষ্ঠ ইমাম হন। এবারেও মতভেদ দেখা দেয়। মুহম্মদ আল বাকেরের অপর পুত্র আবু মনসুরকে একদল ৬ষ্ঠ ইমামরূপে ঘোষণা দেয়। আবু মনসুরই আলী বংশের অন্যতম প্রথম ব্যক্তি যে দাবী করে, যে ইমামই স্বর্গীয় অধিকার ভোগকারী এবং তাদের ভক্তেরা এটা অত্যন্ত উগ্রভাবে প্রচার করে। তারা দাবী করে যে, তাদের ইমাম আসমানে আরোহণ করে ইলাহী নূরে অলোকিত হয়ে দুনিয়ায় আগমন করেছেন। এ সময় সব উগ্রবাদী শিয়ারা বিশ্বাস করে যে, হযরত আলীর আত্মাই তাদের ইমামের মধ্যে প্রবিষ্ট। আবার অনেকের বিশ্বাস যে, আলীই প্রকৃত নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) সেটা অবৈধভাবে নিয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)। অবশ্য মনসুরীয়া ক্ষুদ্র দল। অধিকাংশ শিয়ারা জাফর আস-সাদেককে ৬ষ্ঠ ইমাম হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। তিনিই আব্বাসীয় আন্দোলনের সময় ছিলেন। হেলেনিক দর্শন ও বিজ্ঞানে তাঁর যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। তাঁকে বাতেনী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। আল কুরআনের গূঢ় তথ্য কেবলমাত্র ইমামগণই জানেন— একথাও প্রচার করা হয়। যেহেতু তাঁরা স্বর্গীয় আলোয় দীপ্ত এবং প্রকৃত জ্ঞান তাঁদের নিকট অবতীর্ণ হয়। তিনি মনসুরের ন্যায় পরবর্তী উত্তরাধিকারীর মধ্যে আত্মা প্রবেশ করার দাবী করতেন। এসব কথা এ সময় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এসব ইরানী ভাবধারা খুব জোরেশোরে শিয়াদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১৩৫ হিজরীতে বার্মেকী উজিররা খিলাফতে জেঁকে বসে এবং ৫৪ বছর ধরে ইরানী সংস্কৃতি দর্শন প্রচারে প্রচুর সাফল্য অর্জন করে।

ইমাম জাফর আস-সাদিকের মৃত্যুর পর শিয়াগণ আবারও বিভক্ত হয়ে পড়ে। জাফর তাঁর পুত্র ইসমাইলকে মনোনয়ন দেন। কিন্তু ভক্তরা যখন দেখল তাদের ইমাম মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেছে, তখন একদল তাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করে জাফরের অন্য পুত্র মুসা আল কাজিমকে ইমামরূপে ঘোষণা দিল। আর একদল তাঁকে ইমামরূপে মেনেই চলল। তাদের বক্তব্য হল, যখন পিতা কর্তৃক ইমামত মনোনীত তখন এটা মানতেই হবে। আর মদ্যপানকে স্বর্গীয় দ্যুতিতে বিচার করতে হবে। কুরআনের মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সাধারণের জন্য, ইমামদের জন্য নয়। কেননা তাঁরা অসাধারণ স্বর্গীয় ব্যক্তিত্ব।

তবুও অধিকাংশেরা মুসা আল কাজিমকেই ৭ম ইমামরূপে স্বীকৃতি দিল। তিনি ১৮৩ হিজরীতে মারা যান। তাঁর পুত্র আলী আর রিজা (মৃঃ ২০২ হিঃ) পরবর্তী ইমাম। সমকালীন আব্বাসীয় খলিফার হাতে তাঁকে খুবই নিগৃহীত হতে হয়। তবে খলিফা আল মামুনের কন্যাকে বিবাহ করে তিনি খলিফার অনুগ্রহভাজন হন। পরবর্তীকালে তাঁকে আব্বাসীয় খিলাফাতের উত্তরাধিকারী হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য খলিফা মামুনের চিন্তা ছিল, যদিও তা বাস্তবে নানা কারণে সম্ভব হয়নি। আলী আর রিজা ৮ম এবং মুহম্মদ আল জাওয়াদ (মৃঃ ২২০ হিঃ) ৯ম ইমাম। ১০ম ইমাম আলী আল হাদী (মৃঃ ২৫৪ হিঃ) ১১শ ইমাম আল হাসান, দ্বাদশ ইমাম হলেন মুহাম্মদ আল মুনতাযির। ইনি ২৬০ হিজরীতে সামারার মসজিদ থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। তাঁকে আর দেখা যায়নি। তিনি

www.waytojannah.com

এখনও জীবিত। আবার তিনি আসবেন। এটাই দ্বাদশ ইমামীদের ধর্মীয় বিশ্বাস। যারা মুসা আল কাযিমের ইমামতকে স্বীকৃতি দেয় না, তারা ইমাম ইসমাইলকে ৭ম ইমামরূপে বরণ করে। ইমাম ইসমাইল পিতার জীবদ্দশায় ১৪৫ হিজরীতে মারা যান। ইমাম ইসমাইল মুহাম্মদ নামে এক পুত্র রেখে যান। যদিও ইসমাইলের মৃতদেহ সকলের সম্মুখে দাফন করা হয় আলবাকীতে, তবুও অতিভক্তের দল মনে করে যে তিনি মরেননি, বসরাতে আছেন। আর যারা তাঁর মৃত্যুকে স্বীকার করে নেয় তারা বিশ্বাস করে যে, তাঁর পুত্র মুহাম্মদের উপর পরবর্তী ইমামত বর্তিয়েছে। তাঁর আত্মা মুহাম্মদের মধ্যে ঠাঁই নিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে ইসমাইল ও মুহাম্মদ অভিন্ন সত্তাধিকারী। পরবর্তীকালে এই ইসমাইল ও মুহাম্মদের উত্তরসূরীরাই ইসমাইলীয়া বা সাবয়ী বা সপ্তম ইমামীয়া নামে পরিচিত।

www.waytojannah.com

হযরত আলীর (রাঃ) বংশ তালিকা

১. হযরত আলী (রাঃ) মৃ. ৪১ হিঃ

- (স্ত্রী) হযরত ফাতিমা (রাঃ)
  - ২. হযরত হাসান (রাঃ) (মৃঃ৫০)
    - হাসান
      - মুহাম্মদ
        - (মরক্কোর শরীফবংশ)
      - আব্দুল্লাহ
        - ইদরিস
          - উত্তর আফ্রিকায় ইদরিসীয় বংশ
  - ৩. হযরত হোসাইন (রাঃ) (মৃঃ ৬১)
    - ৪. আলী জয়নুল আবেদীন মৃ:৯৪
      - জায়েদ
        - (উত্তর পারস্য ও দঃ আরবে জায়েদীয়া দল)
      - ৫. মুহাম্মাদ আল বাকির মৃ:১১৩
        - ৬. জাফর আস সাদিক মৃ: ১৪৮
          - ৭. ইসমাইল মৃঃ ১৪৫
            - মুহাম্মদ
            - ফাতিমীয় বংশ
          - ৭ক. মুসা আল কাজিম (মৃ:১৮৩)
            - ৮. আলি আর রিজা (মৃ. ২০২)
            - ৯. মুহাম্মদ আল জাওয়াদ (মৃ ২২০)
            - ১০. আলী আল হাদী (মৃ ২৫৪)
            - ১১. হাসান আল আসকারী (মৃ২৬০)
            - ১২. মুহাম্মদ আল মুনতাযির
            - (২৬০ হিজরীতে অদৃশ্য হয়ে যান)
- (স্ত্রী) আল হানাফিয়াহ
  - (পুত্র) মুহাম্মদ

www.waytojannah.com

ইসমাইলীয় সম্প্রদায়

শুরুতেই ইসমাইলীয়গণ স্বর্গীয় আত্মা, আত্মার অবতরণ, অবতারবাদ, আল কুরআনের বাতেনী অর্থ বুঝবার ক্ষমতা কেবলমাত্র ইমামের প্রভৃতি মতবাদ বিশ্বাস ও প্রচারে যত্নবান হয়ে পড়ে। যদিও তারা অনেক কথা বিকৃত ও জাল করে মহানবীর (সঃ) হাদিস নামে চালিয়ে দেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত ধারণাগুলি গ্রীক দর্শন, ইরানী ভাবধারা এবং যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তার আবিষ্কার।

শিয়া মযহাবের প্রখ্যাত বিদ্বান আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে ইসাহাক ইবনে ইয়াকুব আল কোলেনী রচিত গ্রন্থ আল কাফীকে তারা সহীহ বুখারীর সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করে। এই কিতাবের বরাতে আল্লামা মুহিউদ্দিন আল খতীব তুহফা ইসনা আশারিয়ার ১১৫ পৃষ্ঠার টীকায় আল কাফী গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠার উদ্বৃতি দিয়ে বলেনঃ- 'আবু বাসীর ইমাম জাফর আস-সাদিকের মসহাফে ফাতিমা সংরক্ষিত আছে। তারা কি জানে মসহাফে-ফাতিমা কি? ঐ মসহাফে তোমাদের এই কুরআনের মতই তিনগুণ আছে। আল্লাহর কসম! তাতে তোমাদের কুরআনের একটি অক্ষরও নেই।" এমনি ধরনের অনেক মিথ্যা, বানোয়াট ও কল্পনাপ্রসূত কথা আছে।

ফাতিমীয় মতবাদগুলি সুবিন্যস্ত করে জনগণের সমর্থন লাভের জন্য একজন দক্ষ সংগঠকের আবির্ভাব ঘটে। তিনিই হলেন আব্দুল্লাহ বিন মায়মুন। সদস্য সংগ্রহের বিষয়ে ৭টি স্তরে বিভক্ত ছিল। কর্মীদের গুণগত মান বিচারে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করা হোত এবং সেগুলি ছিল খুবই গোপনীয় ব্যাপার। ইসলামের সাথে তার সম্পর্ক ছিল কদাচিত কিন্তু বহিঃপ্রভাব সবটাই। লেনপুল সাহেব মন্তব্য করেনঃ- In its inner essence, shiism, the religion of the Fatimids is not Mohammedeanism at all. It merely took advantage of an old schism in Islam to graft upon it a totally new and largely political movement. ১

অভ্যন্তরীণ সত্তায় ফাতিমীয় ধর্ম শিয়া মতবাদ; মোটেই মুহাম্মদী মতবাদ নয়।এটা একটা পুরাতন প্রশাখার সুযোগ নিয়ে ইসলামকে ব্যবহার করে সম্পূর্ণ নতুন প্রলেপ প্রদানের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনরূপে।

এখানে শিয়ামত সপ্তম ইমামে বিশ্বাসী দলকে বুঝায়—রাজনৈতিক আন্দোলন নিছক খিলাফতের বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধা সৃষ্টির মানসে। অধ্যাপক নিকলসন সাহেব মনে করেন যে, প্রচলিত শাসন ক্ষমতাকে উৎখাত করার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন অত্যন্ত গোপনে সমাজে প্রতিবাদী গোষ্ঠীর মনোভাবকে কাজে লাগিয়ে আপন লক্ষ্যপ্রাণে অত্যন্ত দূরদৃষ্টির সাথে শিয়া মতবাদকে ব্যবহার করেন। O'Leary সাহেব মন্তব্য করেন যে—Undoubtedly the ideas involved in the Ismailian doctrines were totally subversive of the teachings of Islam. ২ নিঃসন্দেহে ইসমাইলীয় ধ্যান— ধারণা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং ক্ষতিকর। মূলতঃ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাবিরোধী প্রচারণায় এই দলের দায়ীগণ ব্যাপৃত ছিল। আব্বাসীয়দের বিরোধী

১. O'Leary D.D - P. 12
২. ঐ - P. 13

www.waytojannah.com

শক্তি হিসাবে ইসমাইলীয়গণ গভীর চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। তবে একথা ঠিক যে, ক্ষমতা গ্রহণের জন্য বা সিংহাসন দখলের জন্য শিয়াদের সমর্থন ও সহযোগিতা আব্বাসীয়গণ অকৃপণভাবে গ্রহণ করে আর ক্ষমতায় বসেই তাদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে সর্বোতভাবে। তবে তাদের মতবাদের কাঠামোতে এ্যারিস্টটলের দর্শন এবং গ্রীক দর্শনের বিষয়কে ঠাঁই দিয়েছে ইসলামের উপর। অবতারবাদ ও আত্মার স্থানান্তরণ মেসোপটেমীয় ও পারসিকদের মনে যথেষ্ট আকর্ষণ সৃষ্টি করে। আইয়্যামে জাহেলিয়াতে এ ধারণা এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। আবু মুসলিমের আন্দোলন, বিয়া ফরিদ (ভণ্ড নবী), রাওয়ান্দিয়া (রাজা পূজার দল) আল মুকান্না (খোরাশানের বস্ত্রাবৃত নবী) বাবাক আল খুররামী (স্বর্গীয় দেবতার অবতার) প্রভৃতি ব্যক্তির আবির্ভাব ও কর্মপ্রণালী উক্ত ভাবধারারই পৃষ্ঠপোষক। সম্প্রতি বাবী আন্দোলন, যা আমেরিকাতেও ব্যাপ্তি লাভ করেছে— সবই অভিন্ন অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ এবং ভাববাদেরই সংস্করণ। শিয়াদের ইমামের মৃত্যুর পর তাঁর নবজন্ম পরবর্তী ইমামের মধ্যে অথবা ইমামের অন্তর্ধান বা লুক্কায়িত ইমাম লোকচক্ষুর অন্তরালে অপেক্ষা করছে সঠিক সময়ের জন্য। তারপর আবার তাঁদের আবির্ভাব ঘটবে যখন যথার্থ সময় আসবে। তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে শাহ বা রাজারা।

আব্দুল্লাহ বিন মায়মুন কর্তৃক প্রচারিত শিয়া মতবাদ বিভিন্ন নামে প্রসার লাভ করে। ইসমাইলীয় ইমাম জাফর আস সাদিকেরপুত্র ইসমাইলের নামানুসারে। সাবায়ী ও সপ্তক ইমামীয়া দল Seveners নামেও প্রচলিত। কারণ এরা ইমাম ইসমাইলকে সপ্তম ইমামরূপে বিশ্বাস করে। ৭ম ইমামে বিশ্বাসের পিছনে ৭সংখ্যার বিশেষত্বও তারা ব্যাখ্যা করে। যেমন, ৭ জন নবী, ৭ জন ইমাম, ৭ জন মাহদী, ৭টি স্তর। আবার অনেকেই বলে যে ফাতেমীয় নামটিই যুক্তিযুক্ত। তবে দ্বাদশ ইমামীয়াগণও ফাতেমীয়, জায়েদীয়গণও ফাতেমীয় অর্থাৎ হযরত আলী ও হযরত ফাতিমার বংশের যে কোন শিয়া সম্প্রদায়ের জন্য ফাতেমীয় উপাধি বৈধ। আর একটা নাম হল বাতেনী সম্প্রদায়। তবে এ নামটি অন্য শিয়ারাও ব্যবহার করতে পারে। কেননা সকলেই আল কুরআনের গোপন অর্থের কথা বলে। এদেরকে আবার কারমাতীয় বলা হয়।

তবে যারা বসরা কুফার মধ্যবর্তী সাওয়াদ এলাকায় কারমাতীয়ান নামে ইসমাইলীয় মতবাদ প্রচার করত কেবল তাদেরকে এই নামে অভিহিত করা হোত। পরবর্তীকালে এরা মূল ইসমাইলীয় দল থেকে বেরিয়ে যায়। ইসমাইলীয়গণ তাদের প্রচারণা চালায় প্রচারক দল প্রেরণ করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে। এদেরকে দায়ী বলা হয়। এই দলের জনপ্রিয়তার মূলে ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন মায়মুন।

মায়মুন সম্পর্কে অনেক তথ্য ঐতিহাসিকেরা প্রদান করেছেন তাঁর পূর্বপুরুষকে নিয়ে। তবে আবুল ফিদা বলেন যে, তিনি কারাজ বা ইস্পাহানের অধিবাসী এবং শিয়া মত গ্রহণ করেন। তবে প্রকৃতপক্ষে তিনি যিনদিক ছিলেন। যিনদিক তারা যারা মারসিয়ন বারডাইসান এবং মানির অনুসারী। তারা সুন্নী মুসলিমদের মতে ধর্মচ্যুত বা ধর্মদ্রোহী। তারা আল কুরআনের সৃষ্টিতত্ত্ব স্বীকার না করে গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের বস্তুতত্ত্ব এবং দ্রব্যের অবিনশ্বরত্বকে স্বীকার করে। ইবনে খালদুন বলেন যে, মায়মুন

www.waytojannah.com

কিছুসংখ্যক অনুসারী নিয়ে জেরুজালেমে চলে যান এবং একজন যাদুকর, গণক, ভবিষ্যদ্বক্তারূপে খ্যাতি লাভ করেন।

ঐতিহাসিক মাকরিজির বর্ণনায় মায়মুনের পুত্র আব্দুল্লাহ ধর্মশাস্ত্রে বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং আইন, ব্যবহারিক জ্ঞান ও ফিরকা বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। মূলতঃ মায়মুনের পুত্র আব্দুল্লাহ এই সম্প্রদায়ের শিক্ষক, প্রচারক ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইসমাইলীয় মতবাদ সুসংগঠিত করা, মতবাদকে জোরাল যুক্তির উপর দাঁড় করানো, যুক্তিবাদ ও বস্তুবাদকে নিয়ে আল কুরআনের গুপ্ত রহস্য কেবলমাত্র ইমামদের জানা এসব বিষয় নিয়ে নেতৃত্বকে অলৌকিক স্বর্গীয় আলোকদীপ্ত করার কাজটি আব্দুল্লাহ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে করেন। তিনি মিযান নামে একখানা কিতাবও রচনা করেন। আব্দুল্লাহ ও তাঁর প্রচারকগণ আল কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু অদ্ভুত প্রশ্ন তৈরি করে জনসমাজে রাখতেন যে, তার উত্তর কেবলমাত্র স্বর্গীয় ইমামগণ ব্যতীত আর কারো জানা নেই। ওহীর জ্ঞান খুবই কঠিন—আলকুরআন সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়, ফলে এর ব্যাখ্যায় বিচিত্র মত ও দলের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক। তবে সঠিক উত্তর ইমামদের নিকট রক্ষিত। আর ইমামগণ মাছুম নিষ্পাপ, অতএব তাঁদের জওয়াবও নির্ভুল। এভাবে জনসাধারণকে তারা বোঝাত। কাবায় হজ্জ করতে গিয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানোর অর্থ কি? দোজখের শাস্তি আসলে কি? কেন ৭ দোজখ? ৭ জমীন? এবং সূরা ফাতিহাতে ৭ আয়াত সৃষ্টি করা হয়েছে? এমনিভাবে আরো প্রশ্ন এনে তারা জনগণকে হতভম্ব করত যে এসব উত্তর কুরআনে নেই এবং ইমাম ভিন্ন আর কেউ এর সঠিক উত্তর দানে সক্ষম নয়। আল কুরআন একজন ব্যাখ্যাকার ছাড়া বুঝবার জন্য অসম্পূর্ণ। আর এসব প্রশ্নের উত্তর বা সব গুপ্ত রহস্যের উত্তর আল্লাহ সকলের নিকট ব্যক্ত করেন না। কেবলমাত্র যারা বাছাই করা যোগ্য অঙ্গীকারাবদ্ধ অর্থাৎ যারা নিষ্ঠার সাথে শপথ করে বায়আত নেবে তাদের নিকট রহস্য উন্মোচন করা হবে। এমনিভাবে অলীক কল্পকাহিনী ও গুপ্তকথার মোহ সৃষ্টি করে জনগণকে প্রলুব্ধ করত দলে আনার জন্য এবং দলভুক্ত হয়ে জান মাল কুরবানী করার শপথে দীক্ষিত করত।

প্রথম স্তরে তারা বলে, কুরআনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থ আছে কিছু ব্যক্ত আর কিছু গুপ্ত রহস্য আছে যা প্রকাশ সর্বসাধারণের জন্য নয়।

২য় স্তরে তারা বলে, প্রচলিত ইসলাম গ্রহণ করে মানুষ ভুলের মধ্যে পড়ে আছে। একজন প্রকৃত ও যোগ্য শিক্ষক ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয় এবং সেই শিক্ষক গুপ্ত বিষয়ে অবহিত।

৩য় স্তরে দায়ীগণ প্রচার করে যে, সেই শিক্ষকের গুণাবলী কি হবে? নিশ্চয় তারা স্বর্গীয় আলোকপ্রাপ্ত স্বর্গীয় মনোনীত সাতজন ইমাম হযরত আলী থেকে ইমাম জাফর আস সাদিক এবং সপ্তম ইমাম ইসমাইল অথবা তার পুত্র বা পৌত্র মুহাম্মাদ এবং তারা অভিন্ন আত্মার অধিকারী। আর জাফর আস সাদিকই অভ্রান্ত সঠিক গুপ্ত রহস্যের জ্ঞান ইসমাইলকে দিয়েছেন মুসা আল কাজিমকে নয়।

৪র্থ স্তরে, জগৎকে সাতটি যুগে বিভক্ত করে প্রত্যেক যুগে একজন করে নবী ও তার

www.waytojannah.com

সহকারী দিয়েছেন। যেমন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আর তাঁর সহকারী নবী হযরত আলী এবং ৭ম আল কাইয়েম আর তাঁর সহকারী আব্দুল্লাহ।

পঞ্চম স্তরে এটাই শিক্ষা দেয়া হোত যে, প্রচলিত ইসলাম ক্ষণস্থায়ী এবং অনু-ল্লেখযোগ্য। বাহ্যিক রূপের স্থলে গোপন তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য অনুসারীদের অনুপ্রাণিত করা হোত।

৬ষ্ঠ স্তরে কাউকে প্রবেশাধিকার দেয়া হোত না যতক্ষণ সে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য পরীক্ষিত ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হোত। ইসলামের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ নিয়মনীতি রীতি পদ্ধতি বা অনুশাসন সবগুলি বাতিল বলে স্বীকৃতি দিতে হোত। সালাত, সিয়াম, হজ্জ্ব এবং অন্যান্য মৌলিক বিধানগুলিও পরিত্যাগ করার সবক দেয়া হোত। তবে লোক দেখানোর জন্য অথবা সামাজিক কানুন রক্ষার্থে ঐগুলি হালকাভাবে পালন করার এখতিয়ার ছিল। এ স্তরে এ্যারিষ্টটল, প্লেটো, পিথাগোরাস ও অন্যান্য দার্শনিকদের দর্শন আলোচনা করা হোত এবং প্রশংসা করা হোত।

সপ্তম স্তরে হাতেগোনা কয়েকজনকে মাত্র স্থান দেয়া হোত। তাঁরা খুবই উঁচু স্তরে নির্বাচিত মনে করা হোত। এ স্তরে সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্য যুক্তিবাদ ও দর্শনের জটিল বিষয়গুলি আলোচিত হোত। তারা সুযোগমত আল কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা করত সম্পূর্ণ নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং বিশ্বাসের আঙ্গিকে। এটাই ছিল দায়ীদের প্রচারকার্যের নিপুণতা ও চতুরতা।

দায়ী বা প্রচারকদল অবস্থা বুঝে প্রচার কাজ চালাত। কোন সময় ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, গোত্র, সম্প্রদায় বা জাতীয় বিষয়ে, আবার কোন সময় গোপন রহস্যের কথা বলে লোকদের আকর্ষণ সৃষ্টি করে। হতে পারে সেগুলি আজগুবি বানোয়াট অথবা পৌরাণিক। আরবদের নিকট ইরানীদের দোষ ত্রুটির কথা আর ইরানীদের নিকট আরব খলিফাদের সমালোচনা করত। সত্যি কথা বলতে কি আব্দুল্লাহ বিন মায়মুনের সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অতুলনীয়। তাঁর নির্দেশ ছিল দায়ীদের প্রতি সুন্নীদের নিকট খলিফাদের গুণকীর্তন, শিয়াদের নিকট হযরত আলী ও হযরত ফাতিমার (রাঃ) উচ্ছ্বসিত অতিমানবীয় প্রশংসা করা। খৃষ্টান, ইহুদিদের নিকট মুসলমানদের সমালোচনা করা। এমনিভাবে প্রচারকদলের জন্য প্রতিটি ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনীতিক ও দার্শনিক বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া আবশ্যিক ছিল।

আব্দুল্লাহ বিন মায়মুন প্রথমতঃ বসরাতে তার প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে কিন্তু সেখানে জনমনে তার বিরুদ্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় ২৬১ হিজরীতে পারস্যে চলে যান। সেখানে হযরত আকিল বিন আবি তালিবের পরিবারের সাথে বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর সিরিয়ার সালামিয়াতে চলে যান। সেখান থেকে প্রচারক দল বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করতেন। তারা মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বিন জাফর আস সাদিকের অনুকূলেই কাজ করত।। ইসমাইলকে গুপ্ত ইমাম আর আব্দুল্লাহ নিজেকে মাহদী হিসাবে চিহ্নিত করতেন। সালামীয়াতে আব্দুল্লাহর মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র আহমদ তার উত্তরসূরী হয়ে কাজ করতে থাকেন। ২৬৬ হিজরীর দিকে বসরা হতে ইয়েমেনে প্রচারকদল প্রেরিত হয় এবং আহমদ পিতার ন্যায় শিয়া মতবাদ বিস্তারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সময় কারমাতীয়ান দলের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

www.waytojannah.com

আহমদের মৃত্যুর পর পুত্র হোসাইনও মারা যায় সাঈদ নামে এক পুত্র রেখে। এই সাঈদই পরবর্তীকালে উবাইদুল্লাহ উপাধি গ্রহণ করে মাহদীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং উত্তর আফ্রিকাতে ফাতিমীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তার মৃত্যু হয় ৩২৩ হিঃ (৯৩৪ সালে)। তার নাম সাঈদ তবে তাকে বিভিন্ন শাখায় যুক্ত করা হয়। যেমন ঃ-
১. আব্দুল্লাহর পুত্র আহমদ পুত্র হোসাইন পুত্র সাঈদ; ২· আহমদের পুত্র সাঈদ; ৩· সাইদ পুত্র আবু সালাঘ লাঘ। আরও একটি ঘটনার সাথে উবায়দুল্লাহর পিতৃপরিচয় যুক্ত করা হয়। তা হোল সে একজন ইহুদি কর্মকারের পুত্র। তার বিধবা মাকে আহমদের পুত্র হোসাইন বিবাহ করে এবং হোসাইনের সে পালিত পুত্র।
এ ভাবেই ফাতিমীয় বংশকে তিনটি ধারায় ইহুদিসূত্রে সংযুক্ত করা হয়।
১. মায়মুন বিন দায়সান একজন ইহুদি ছিলেন। ২· উবাইদুল্লাহ প্রকৃতপক্ষে একজন ইহুদিসন্তান। ৩. ইবনে কিল্লিসও একজন ইহুদি সন্তান যিনি ফাতিমীয় সরকার সুগঠিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন এবং মিশর আক্রমণে তাঁর উৎসাহ ছিল উল্লেখযোগ্য। এ কারণেই ফাতিমীয় শাসনে ইহুদিদেরকে যথেষ্ট আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়।
আরো একটা বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া যাক। সেটা হোল উবায়দুল্লাহ আল মাহদী বা আব্দুল্লাহ বিন মায়মুন প্রতিষ্ঠিত ফাতিমীয় বংশটির সাথে ফাতিমীয়দের রক্তের যোগসূত্র কোথায়? আব্দুল্লাহ নিজকে মাহদীরূপে বিঘোষিত করেই সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও নিজকে ইমাম বলেননি, বরং গুপ্ত ইমাম ইসমাইলের বা তাঁর পুত্র মুহাম্মদের কথাই জনসমাজে প্রচার করতেন। ঐতিহাসিকগণ ফাতিমীয়দের প্রতিষ্ঠিত বংশকে কতটুকু হযরত আলীর বংশে যুক্ত সে বিষয়ে যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। আবুল হাসান মুহাম্মাদ মাসাভী সাধারণতঃ রাজী নামে খ্যাত। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন ৩৫৯ হিজরীতে আর মারা যান ৪০৬ হিজরীতে। তিনি নিঃসন্দেহে আলীর (রাঃ) পুত্র হোসাইনের (রাঃ) বংশধর। আর তাঁকে সরকারীভাবে হযরত আলীর বংশতালিকা সংরক্ষক হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনিও ফাতিমীয় শাসকদের বংশতালিকা আলী বংশীয় দেখাতে অস্বীকার করেছেন। যদিও এটা রাজনৈতিক বিরোধী মতবাদ বলে সমালোচিত হয়েছে। মিশরীয় ইতিহাসের প্রবক্তা মাকরিজী, যিনি ফাতিমীয়পন্থী বলে পরিচিত এবং নিজ সৈয়দ বংশের উত্তরসূরী বলে গর্বিত, তিনিও ফাতিমীয়রা যে আলী বংশীয় সেটা বলায় অনেক আপত্তি করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন মায়মুনকে আলী বংশের সাথে যুক্ত করে মূল ফাতিমীয় বংশতালিকায় একটা Post Mortem করা হয়েছে।
আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুনের প্রপৌত্র সাঈদ ওরফে উবাইদুল্লাহ আল মাহদী যখন আফ্রিকাতে ফাতিমীয় বংশের শাসন কায়েম করলেন তখন ঐতিহাসিক এবং বংশতালিকাবিদগণের দৃষ্টিপথে এল একটা বড় রকমের কৌতূহল। এই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নয় প্রকারের মতামত পাওয়া গেল।
১ম মত ঃ ৬ষ্ঠ ইমাম জাফর আস-সাদিক-পুত্র ইসমাইল-পুত্র মুহাম্মদ (গুপ্ত ইমাম)। অতঃপর জাফর আল মুসাদ্দিক-অতঃপর মুসা আল হাবিব-অতঃপর উবায়দুল্লাহ। এখানে আব্দুল্লাহ এবং আহমদ অনুপস্থিত।
২য় মতঃ জাফর আস সাদিক-মুহাম্মাদ-অতঃপর আব্দুল্লাহ আর রিজা-আহমদ আল

www.waytojannah.com

ওয়াফি–আল হোসাইন আত তকী–উবায়দুল্লাহ আল মাহদী। এটা ইবনে খাল্লিকান ও ইবনে খালদুনের মতে সরকারী মত। এখানে আব্দুল্লাহ আহমদের পিতা গুপ্ত ইমাম মুহাম্মদের পুত্র হিসাবে দেখানো হয়েছে, মায়মুনের পুত্র হিসাবে দেখানো হয়নি। অথচ ঐতিহাসিক তাবারী বলেন যে, মুহাম্মদ বিন ইসমাইলের আব্দুলাহ নামে কোন পুত্র ছিল না।

৩য় মত ঃ মায়মুন গুপ্ত ইমাম মুহাম্মাদের পুত্র। অতঃপর আব্দুল্লাহ–মুহাম্মাদ–উবায়দুল্লাহ। আব্দুল ফিদার মত এটা। সপ্তম ইমামের পুত্র হিসাবে মায়মুনকে দেখানো সত্যিই অবাস্তব ও অসম্ভব।

৪র্থ মত ঃ জাফর আস–সাদিক–পুত্র ইসমাইল পুত্র–মুহাম্মদ অতঃপর ইসমাইল–আহমদ–উবায়দুল্লাহ। মুহাম্মাদের তিনটি পুত্র ছিল–ইসমাইল (২য়) জাফর ও ইয়াহয়া। আহমদ নামে ইসমাইলের আর একটি পুত্র ছিল, যে আল মাগরিবে বসবাস করত।

৫ম মত ঃ ইসমাইল–মুহাম্মাদ–ইসমাইল (২য়) মুহাম্মাদ–আহমদ–আব্দুল্লাহ–মুহাম্মাদ–হোসাইন–আহমদ–উবায়দুল্লাহ আল মাহদী। শিয়া দলের দারাজী উপদল কর্তৃক প্রদত্ত এটাই ফাতিমীয় বংশতালিকা।

৬ষ্ঠ মত ঃ উল্লেখিত পাঁচটি তালিকা ইসমাইলীয় ৭ম ইমামীয়া সংবলিত। এক্ষণে দ্বাদশ ইমামীয়াদের তালিকা নিম্নরূপঃ

১।	জাফর আল সাদিক	৬ষ্ঠ ইমাম
২।	মুসা আল কাজিম	৭ম ইমাম
৩	আলী আর রিজা	৮ম ইমাম
৪।	মুহাম্মাদ আল জাওয়াদ	৯ম ইমাম
৫।	আলী আল হাদী	১০ম ইমাম
৬।	আল হাসান আল আসকারী	১১শ ইমাম
৭।	উবায়দুল্লাহ আল মাহদী	১২শ ইমাম

এখানে মুহাম্মাদ আল মুনতাসির দ্বাদশ ইমামের পরিবর্তে উবায়দুল্লাহ আল মাহদীকে দেখানো হয়েছে।

৭ম মত ঃ উল্লেখিত তালিকায় ৭ম নম্বরে দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মাদ আল মুনতাযির হবেন যিনি ২৬০ হিজরীতে অদৃশ্য হয়ে যান এবং ২৯ বছর পর উত্তর আফ্রিকাতে উবায়দুল্লাহ আল মাহদী নামে গুপ্ত স্থান হতে আবির্ভূত হন।

৮ম মত ঃ আলী আল হাদীর পর সম্ভবতঃ হাসান আল আসকারীর ভাই আল হোসাইন এবং পুত্র উবাইদুল্লাহ আল মাহদী। ইবনুল আসীরের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে খাল্লিকান এই মত প্রকাশ করেছেন। এই তিন প্রকারের (৬·৭·৮) মত ইসমাইলীয়দের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারা জাফর আস সাদিকের উত্তরসূরী ইসমাইল ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে বিশ্বাসী নয়। তবে আহমদ আলীবংশীয় দাবীদার হলেও ইসমাইলের বংশতালিকাভুক্তির আবশ্যকতা নিষ্প্রয়োজন।

নবম মত ঃ ইবনে খাল্লিকান আরও একটি মত ব্যক্ত করে বলেন যে, উবায়দুল্লাহ আল

www.waytojannah.com

মাহদী ইমাম জাফর আস–সাদিকের ভ্রাতা হাসানের উত্তরসূরী এবং তা আলীবংশের, তবে তিনি ইমাম নন। সূত্র এরূপ—হাসান–আব্দুল্লাহ–আহমদ–হাসান–আলী বা উবায়দুল্লাহ আল মাহদী। আব্দুল্লাহ পর্যন্ত সূত্রটিই মাহদীর পারিবারিক তালিকা, তবে হাসানের পরিবর্তে মায়মুন হবে।

এতগুলি বংশতালিকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটিতে একটা না একটা খুঁত আছে যা প্রকৃত বংশ তালিকারূপে গ্রহণ করতে ঐতিহাসিকদের আপত্তি। তবে যেহেতু তাঁরা তাদের মতামত ব্যাপকভাবে প্রচার করে একটা শক্তিশালী দল তৈরি করে শাসন ক্ষমতা দখল করেন, সেহেতু তাঁদের বিভিন্ন মতের বংশতালিকা কারো চোখে বড় করে দেখা দেয়নি। 'যে যা দাবী করে তাতে কি আসে যায়। এমনভাবে বিভিন্ন প্রচারকদল বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করে জনমনে ইসমাইলীয় ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, এটাই তাদের বড় কৃতিত্ব।

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খলিফা উবায়দুল্লাহ আল মাহদী (২৯৭ হিঃ-৩২২ হিঃ)

সিরিয়ার সালামিয়াতে ২৬০ হিজরীতে উবায়দুল্লাহ আল মাহদীর জন্ম। পিতা হোসাইনের ২৬৮ হিজরীতে মৃত্যুর পর তিনিই ইমামরূপে বরিত। প্রাথমিক জীবন অজানা, তারপর গোপন অবস্থান থেকে মাহদীরূপে আত্মপ্রকাশ এবং শিয়া মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ। প্রথমে তিনি দেখেন যে ফাতিমীয় সংগঠন তাঁর চাচা সাঈদ আল খাইরের কবজায় আর পিতৃব্যের সন্তানেরা জীবিত নেই। যুবক উবাইদুল্লাহ পিতৃব্য-কন্যার পাণি গ্রহণ করে সংগঠনের দায়িত্বভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। সালামিয়াতে গুপ্তভাবে বণিকবেশে বসবাস করতে থাকেন আর নানা স্থান থেকে তাঁর অনুসারীরা এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করত। প্রচারক বা দায়ী দলকে নানা কৌশলে বিভিন্ন জনপদে প্রেরণ করা হোত। অনেক অলীক কাহিনী ও রহস্যের কুটজালের মোহ সৃষ্টি করে অজানাকে জানার আর অলৌকিক রহস্যের সন্ধানে প্রচুর লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ফাতিমীয় আন্দোলনকে বলিষ্ঠ করে তোলে।

ঠিক এমনি এক সময়ে মাহদী চিন্তা করলেন যে, ফাতিমীয় শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। তবে সমস্যা হোল কোথায় সেই স্থান উপযুক্ত। দায়ীদের মধ্যেও মতবিরোধ। একটা প্রস্তাব হোল, আব্বাসীয় খিলাফত উচ্ছেদ করে ইরাকে এবং অন্যটি হোল খোদ আরব ভূখণ্ড ইয়েমেনে-সেখানে পর্বতরাজি থাকায় নিরাপদ। আর তৃতীয়টি হোল আরব দেশ হতে বহুদূরে আল মাগরিবে-এক নতুন দেশে! এই সময়ে ইসমাইলীয়দের প্রশাখা কারমাতিয়ানরা তাদের জন্য হুমকিস্বরূপ দেখা দিল।

কারমাতীয় (Qarmatians)

ইসমাইলীয়দেরই একটা প্রশাখা। তবে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা খুবই উগ্রপন্থী। সন্ত্রাস করে ধনসম্পদ জনগণের মধ্যে বন্টনপূর্বক একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে বিশ্বাসী। তারা বিরোধী শক্তিকে সহিংসতায় মোকাবেলায় বিশ্বাসী। ইমাম ইসমাইলের জীবিতকালে মুবারক নামক এক প্রচারকের দ্বারা বাহরাইনের উপকূলে কারমাতুয়া শিয়া মতবাদে দীক্ষিত হয়। সে কালক্রমে প্রচারকার্যের ফলে বেশ কিছু অনুসারী ভক্ত সংগ্রহে সক্ষম হয়। যে কোন মতভেদের কারণে মূল ইসমাইলীয় দল থেকে সে সরে পড়ে। নিজের নাম অনুসারে দলের নামকরণ হয় কারমাতীয়। অনেক দায়ী যখন নানা কারণে মাহদীর প্রতি বীত শ্রদধ হয়ে পড়ে তখনই তারা এই

www.waytojannah.com

দলে যোগ দেয়। ফলে ধীরে ধীরে দলের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২৮৬ হিজরীতে হামদান কারমাত যখন প্রস্তাব করল যে আব্বাসীয় খিলাফত উৎখাত করে ইরাকে ফাতিমীয় শক্তি বা শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তখন মাহদীর সাথে তার মতভেদ শুরু হোল। মাহদী তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে সে কারমাতীয়দের দলে যোগ দেয়। অনেকে বলে যে তার নাম অনুসারেই কারমাতীয়, তবে এটা বিচার-বিবেচনা সাপেক্ষ। কারমাতীয়দের আরও একটা উপদল তৈরী হয় ২৯০ হিজরীতে জাকরুয়া বিন মাহদুয়ার নেতৃত্বে। তারা কুফাতে তাদের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র করে। তারাও কালক্রমে শক্তিসঞ্চয় করে সিরিয়াতে অভিযান চালায় এবং দামেস্ক ও হিমস অধিকার করে তো বটেই, উপরন্তু সালামিয়াতে মাহদীর অবর্তমানে লুটতরাজ করে অনেক মূল্যবান সম্পদ হস্তগত করে। কারমাতীয়দের এহেন দুষ্কর্ম ও অপতৎপরতার কারণে মাহদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে তাঁর স্থান নির্বাচিত হবে আলমাগরিবে।

কারমাতীয়দের ধ্বংসাত্মক কার্য এত চরমে পৌছে যে, মক্কা মদীনাসহ আরব আজমে শিয়া সুন্নী-আব্বাসীয় ফাতিমীয় সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা বাহরাইনে একটা ছোট রাষ্ট্রও কায়েম করে আবু জাকারিয়া বিন মাহদীর নেতৃত্বে ৩০১-৩২ হিঃ, ৯১৪-৪৩ সালে। আবু তাহির সুলাইমান নিম্ন মেসোপটামীয়াতে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে এবং হজ্জযাত্রার পথও অবরোধ করে। ৯৩০ সালের ৮ই জিলহজ্জ তারা ঠিক হজ্জ শুরু মুহূর্তে মক্কা অবরোধ করে দারুণ ত্রাস সৃষ্টি করে। অবরোধের ৬ দিন পর পবিত্র কাবাগৃহ হতে হজরে আসওয়াদ নিয়ে যায়। দীর্ঘ দিন পরে তাদের নিকট হতে হজরে আসওয়াদ পাথর খন্ডটি উদ্ধার করে কাবাতে পুনঃস্থাপন করা হয়। এদের কার্যালয় কোন সময় সিরিয়া কোন সময় খোরাশান কোন সময় ইয়েমেন আবার অন্য কোথায় স্থাপন করে সন্ত্রাসী কাজ চালায়। তাদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ইসলামী বিশ্বকোষে দ্রষ্টব্য।

কারমাতীয়দের সম্পর্কে DE LACY O'LEARY DD তাঁর A Short history of the Fatimid khalifate গ্রন্থে যে বর্ণনা দিয়েছেন -তা হোলঃ-

৩১১ হিজরীতে তারা বসরা দখল করে। ৩১৭ হিজরীতে তারা জিলহজ্জ মাসে মক্কাতে ঢুকে পড়ে। তাদের অতর্কিত আক্রমণে মক্কার শরীফ তার অনেক সঙ্গী এবং বহু হজ্জযাত্রীসহ নিহত হয়। ৮ই জিলহজ্জ হজ্জের পবিত্র দিনে হারাম শরীফে এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। যে মাসে যে সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ ঠিক সেই মুহূর্তে বর্গী দস্যুর মত কারমাতীয় বর্বর সেনারা হিংস্র পশুর ন্যায় পবিত্র কাবার উপর চড়াও হয়। হজ্জযাত্রীদের লাশ দিয়ে জমজম কূপ ভর্তি করে ফেলে। আল্লাহর ঘরের দরজা নির্মমভাবে ভেঙে চুরমার করে। পবিত্র কাবার গেলাফ ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে। পবিত্র হজ্রে আসওয়াদ কাবার প্রাচীর থেকে খুলে ফেলে অতঃপর তাদের রাজধানী হাজারে নিয়ে যায়। অলিয়ারী সাহেব এহেন মর্মান্তিক দৃশ্যের যে বর্ণনা তাঁর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তা হোল-Never in the History of Islam has there been sacrilege at all comparable to this, and never before had the Qarmatian advertised so boldly their contempt for the muslim religion- page-86

www.waytojannah.com

বাগদাদের আমির বেগকিম কারমাতীয়দের প্রতি পঞ্চাশ হাজার দিনারের পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছিলেন হজরে আসওয়াদ ফিরিয়ে দেবার জন্য কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানায়। এ সময় আব্বাসীয়রা মূলত এত বেশী দুর্বল ছিল যে তাদের এহেন দুর্যোগ মুকাবেলার কোন হিম্মতও ছিল না।

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান ইবনুল আসিরের উদ্বৃতি দিয়ে বলেন যে, এই দুর্ঘটনার পর কায়রোয়ান থেকে ফাতিমীয় খলিফা মাহদী কারমাতীয়দের একটা পত্র লেখেন। অলিয়ারী সাহেব পত্রটি এভাবেই তাঁর ভাষায় বর্ণনা করেন–By what you have done you have justified the charge of infidelity brought against our seet, and the little of impious given to the missionaries acting for our dynesty, if you restore not what you have taken from the people of mecca, the pilgrims and others. If you replace not the black stone and the Veil of the Kaaba, we shall renounce you in this world and the next. page-86

এই পত্রে অবশ্য ফল হয়। তারা কৃষ্ণপ্রস্তর ফেরত দেয়, কিন্তু সাথে সাথে নয়। সুদীর্ঘ ২ দশকেরও বেশী সময়ের পর। অলিয়ারী সাহেবের বর্ণনার ৩১৭ হিজরীতে পাথরখানি নিয়ে যায় আর ৩৩৯ হিজরীর জিলকদ বা জ্বিলহজ্ব মাসে ফেরত দেয়। তখন ফাতিমীয় তৃতীয় খলিফা মনসুরের রাজত্বকাল।

উবায়দুল্লাহ আল মাহদীর কার্যক্রম ঃ

২৮৯ হিজরীতে আল মাহদী নিজ আবাসস্থল সালামীয়া ছেড়ে আল মাগরিবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সিরিয়ার হিমসে উপস্থিত হয়ে জানতে পারেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে উগ্র কারমাতীয়রা সালামীয়া আক্রমণ করে তছনছ করে দেয়। তার সহযোগী দায়ী হোসাইন আল আহওয়াজীকে হত্যা করে। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পরিজনদেরকে উত্যক্ত করে ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়। এসব দুঃখজনক সংবাদে মর্মাহত হয়ে আর সালামীয়াতে প্রত্যাবর্তন না করে মিশরের দিকে যাত্রা করেন। ইতিপূর্বে প্রেরিত তদ্বীয় দায়ী ইবনে ফজল ও হাওসার সানার উত্তরে ইয়েমেনে একটি পর্বতাকীর্ণ অঞ্চলে ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কারমাতীয়রাও ইয়েমেনে সন্ত্রাস চালাতে থাকে বিধায় আল মাহদী ইয়েমেনে যাবার পরিকল্পনাও ত্যাগ করেন। প্রতিকূল অবস্থায় নিজকে প্রতিষ্ঠিত করা নিতান্ত ঝুঁকিপূর্ণ, যেহেতু প্রতিবন্ধকতা তাদেরই স্বজনদেরই সৃষ্ট।

মিশরে অবস্থান কালে তার ২ জন বিশ্বস্ত দায়ী ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম আবু আব্দুল্লাহকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন। কিন্তু আবু আব্দুল্লাহর তথ্য অবগত হয়ে আব্দুল্লাহর ভ্রাতা আবু আব্বাসের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আর আরবে নয়, খোদ মাগরিবে ফাতিমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আবু আব্দুল্লাহকে তাই মাগরিবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এদিকে মাহদীর প্রধান সহযোগী দায়ী ফিরোজ আল মাগরিবে খিলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আদৌ সম্মত হয়নি। সে নারাজ হয়ে মাহদীর বিরোধিতা করে ইয়েমেনে গমন করে। সেখানে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে। কিন্তু সে তার উদ্দেশ্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয় এবং বিরোধীদের সাথে সংঘর্ষে নিহত হয়। এমনিভাবে আল মাহদীকে অনেক পরীক্ষিত একনিষ্ঠ সহযোগীকে হারাতে হয়। তথাপিও তাঁর ভক্তের অভাব হয়নি যেমন তেমনি প্রচারকার্যও স্থগিত হয়নি। ফলে দিনে দিনে শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

www.waytojannah.com

উত্তর আফ্রিকায় বার্বার গোত্র

মরক্কো এবং আলজিরিয়া ও মৌরিতানিয়ায় আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগর কূলে গহীন বনানীর পাবর্ত্য এলাকাগুলি সর্বদা দুর্ভেদ্য ও জনবিরল ছিল। এখানকার উপজাতিরা এসব অঞ্চলে বসবাস করতে অভ্যস্ত। নগর সভ্যতা তাদের নাগালের বাইরে হলেও নানাবিধ কারণে তারা জঙ্গলত্যাগ করতে সহসা সম্মত হত না। আমরা ইতিপূর্বে খলিফা আল ওয়ালিদের রাজত্বকালে গভর্নর সেনাপতি মুসাবিন নুসাইবের কার্যক্রম এ অঞ্চলে প্রত্যক্ষ করেছি। পার্বত্য এলাকাবাসীরা বার্বার গোত্রভুক্ত। তারা শহরমুখী ছিল না, এবং সভ্য সমাজে তাদেরকে আনতে সেনাপতি মুসা ও আরব সেনাদের অত্যন্ত হিকমতের সাথে কাজ করতে হয়েছে। তরবারি বিফল হলেও প্রচার আর বিনয়, সৌহার্দ ও সহমর্মিতায়, জয় হয়েছে ইসলামের উড্ডীন পতাকার। সেই বার্বার গোত্রভুক্ত তারিফ বিন মালিক ও তারিক বিন জিয়াদের রণকৌশল আর বাহুবলে স্পেনের রাজা রডারিক বাহিনী পরাজিত হয়। সেই ৮ম শতকের পাদদেশ থেকে দশম শতকের পাদদেশে এসে ফাতেমীয়দের ইতিহাস নতুন করে বার্বার উপজাতীয়দের পার্বত্য অঞ্চলগুলি আবারও বিশ্ববাসীর দৃষ্টিপথে এল। এই দু'শ বছরের মধ্যে উমাইয়া, আব্বাসীয়, আগলাবীয়, ইদ্রিসীয় ও অন্যান্য বহু মানুষের পদ ভারে এ অঞ্চল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অনেক প্রকাশ্য গুপ্ত আন্দোলনকারীরা প্রাণভয়ে পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছে এ অঞ্চলে। পলাতকদের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি হিসাবে এটা ব্যবহৃত। খারেজীরাও এখানে, আবার শিয়ারাও এখানে। আবু আব্দুল্লাহ যখন ইয়েমেন থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন সেই সময় উত্তর আফ্রিকার কাতামা গোত্রের হজ্বব্রত পালনকারী কিছুসংখ্যক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। তাদের সাথে আল মাগরিবে যান মাহদীর নির্দেশে।

এ সময় আল মাগরিব আগলাবীয় শাসনে ছিল। রাজধানী কায়রোয়ান। আবু আব্দুল্লাহ যোগ্য সংগঠক, প্রচারক ও সেনানায়ক ছিলেন। তিনি দু' লাখ সৈন্য সংগ্রহ করেন। সেখানে সব শিয়াদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করে আগলাবীয় শেষ সুলতান জিয়াদাতুল্লাহ (৯০৩–৯০৯) কে রাকাদায় দারুণভাবে পরাজিত করেন। এ সমুদয় ঘটনা আল মাহদী অবহিত ছিলেন। কিন্তু তখন আব্বাসীয় শাসন চলছে এবং ফাতিমীয়দের প্রতি তারা খুবই ক্রোধান্বিত। আল মাহদী মিশর থেকে ত্রিপোলী এবং সেখান থেকে আল মাগরিবের পথে সিজিল মাসাহতে এলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু এ সংবাদ অতি শীঘ্রই আবু আব্দুল্লাহ জানতে পেরে বিরাট সেনাবহর নিয়ে সিজিল মাসাহ আক্রমণ করেন। তারপর মাহদীকে উদ্ধার করে ২৯৭ হিজরী মুতাবিক ৯০৯ সালে মাহদীকে ফাতিমীয় খলিফা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ৯১০ সালে জানুয়ারী মাসে কায়রোয়ান মসজিদে আমিরুল মুমিনীন হিসাবে তাঁর নামে খুৎবা পঠিত হয় এ কথা লেনপুল সাহেব তাঁর A History of Egypt under the Saracens-এর ৯৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন। আফ্রিকাতে আগলাবীয়রাই ছিল সুন্নী। আবু আব্দুল্লাহ আল শীঈ অত্যন্ত

www.waytojannah.com

Contents

সাফল্যের সাথে সুন্নী খিলাফত ধ্বংশের এই দুরূহ কার্যটি করার ফলে প্রথম বারের মত শিয়া খিলাফত আলমাগরিবে বা উত্তর আফ্রিকাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওবাইদুল্লাহ আল মাহদী ইমাম বা খলিফারূপে বিঘোষিত হলে তাঁকে ফাতিমীয় বংশধররূপে গ্রহণ করা হয়। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে ফাতিমীয় পূর্বসূরীদের বংশানুক্রমিক ইতিহাস। ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইবনুল আসির, ইবনে খালদুন, আল মাকরিযী প্রমুখ উবায়দুল্লাহ আল মাহদীকে ফাতিমীয় বংশজাত বলে উল্লেখ করলেও ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান, ইবনে ইযহারী, আস সুয়ুতি, ইবনে তাযরী বারদী প্রমুখ ফাতিমীয় বংশোদ্ভূত নয় বলে দৃঢ় মত প্রকাশ করেন। তবে এ বিষয়ে দেরীতে হলেও আব্বাসীয় খলিফা আল কাদির বিল্লাহ প্রখ্যাত সুন্নী ও শিয়া মনীষীদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি ফতোয়া ১০১১ সালে প্রকাশ করে বলেন যে, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মিশরীয় ফাতিমীয় খলিফা আল হাকিম হযরত ফাতিমার বংশ হতে আসেননি, বরং ধর্মচ্যুত দাইসান হতে তার পূর্বপুরুষ আগত। আবু আব্দুল্লাহ আশ শীঈর শেষ দিনগুলি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেটেছে। উবাইদুল্লাহ আল মাহদীকে শাসন কার্যে বসিয়ে তিনি রাজ্য শাসনের যে পরিকল্পনা দেন তা মাহদী প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু তাই নয়, আগলাবীয় পরিত্যাক্ত ধন সম্পদগুলিও মাহদী হস্তগত করেন। শাসন পূর্ব সরকারের নীতিতে চলতে থাকে। আবু আব্দুল্লাহ ও তাঁর প্রধান দায়ী ফিরোজ শিয়া মতবাদে দীক্ষিত হয় এবং ফিরোজ কারমাতীয় দলে যোগদান করলেও তার প্রতি আবু আব্দুল্লাহর প্রভাব ছিল বিধায় কারমাতীয়দের ধারণা মুতাবিক মাহদীকে ভু-সম্পত্তি গোত্রের মধ্যে বিলিবন্টন করে স্বশাসিত গোত্রের স্বাধিকার প্রদানের পরামর্শ দিলে মাহদী তা প্রত্যাখান করেন। মাহদী আবু আব্দুল্লাহ ও তার ভাইকে বিরোধী চক্র হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের অতীতের মূল্যবান অবদানকে বেমালুম ভুলে ২৯৮ হিজরীতে হত্যা করেন। তাদের দাফন অনুষ্ঠান জনসমাবেশে মাহদী তাদের উভয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন কিন্তু তাদের সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপেরও নিন্দা করেন। এইভাবেই আবু আব্দুল্লাহ আল শীঈর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। আল মাগরিব ব্যতীত ফাতিমীয় মতবাদ ইয়েমেন, সিন্ধু, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। আবু আব্দুল্লাহর মৃত্যুর পর কদিন ইবনে নুমান নামক দায়ী আল মাহদীর প্রধান উপদেষ্টারূপে কাজ করতে থাকেন। তিনি সংগঠক, প্রচারক, পরামর্শদাতা, নীতিনির্ধারক এবং ফাতিমীয় আন্দোলনের ইতিহাসবেত্তা ছিলেন। পরবর্তী তিনজন খলিফারও উপদেষ্টা ছিলেন এবং কায়রোতে মারা যান।

আল মাহদীর কৃতিত্ব ঃ

উবাইদুল্লাহ আল মাহদী (৯০৯-৩৪) প্রাথমিক ভাবে আগলাবীয় রাজধানী কায়রোয়ানের রাকাদায় স্বীয় কার্যালয় স্থাপন করেন। নিজেকে শাসনকার্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ২ বৎসরের মধ্যেই তিনি সমগ্র আফ্রিকা ভূ খন্ডে ফাতিমীয় প্রভাব বিস্তার করেন। মরক্কোর ইদ্রিসীয় শাসন অঞ্চল হতে সুদূর মিশর পর্যন্ত তাঁর শাসন পরিব্যাপ্ত হয়। ৯১৪ সালে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। সিসিলিতে কিতামা গোত্রের একজন গভর্নর

www.waytojannah.com

নিয়োগ করেন। এই সময় স্পেনের দস্যুরাজ প্রবল শক্তিধর ওমর ইবনে হাফসুনের সাথেও যোগাযোগ রাখেন। স্পেনেও তাঁর দায়ীগণ গোপনে প্রচারকাজ চালাতে থাকে। বেলারিক দ্বীপপুঞ্জ, মালটা, সারদিনিয়া করসিয়াতেও তাঁর নৌবহর ফাতেমীয় পতাকা নিয়ে চলতে থাকে। ৯২০ সালে কায়রোয়ান থেকে কুড়ি মাইল দক্ষিণ পূর্বে তিউনিসীয় কূলে তিনি নিজ নামানুসারে আল মাহদীয়া নামে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মুহাম্মাদীয়া নামে নতুন আরও একটি নগরীর পত্তন করেন। এগুলি কেবল প্রাচীরবেষ্টিত দূর্ভেদ্য নগরী ছিল না বরং এখানে নৌ–বাহিনীর দপ্তরও ছিল। এই লক্ষ্যে এ বন্দর নগরী স্থাপিত হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে এখান থেকে সাফল্যের সাথে মিশর জয় সহজসাধ্য হবে। আল মাহদীর আমলে মিশর অভিযান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মিশরে ২টি অভিযান প্রেরিত হয়।

মিশর বিজয়ের ১ম অভিযান ঃ

৩০২ হিজরীতে তিনি মিশর অভিযান শুরু করেন। তাঁর পুত্র আবুল কাশিমের নেতৃত্বে স্থলপথে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং প্রখ্যাত সেনাপতি খুবাসাকে নির্দেশ দেন আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করতে। সেনাপতির অতর্কিত আক্রমণে বন্দরে ভীষণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জনগণ পোতাশ্রয়ে অবস্থানরত জাহাজে নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় নেয়। এ সুযোগে আক্রমণকারীরা ঘরবাড়ি লুঠ করে। অভিযান ফাইউমের দিকে অগ্রসর হলে বাগদাদ থেকে প্রেরিত ও মিশরীয় সেনাবাহিনীর যৌথশক্তির মুকাবেলায় পশ্চাদপসারণে বাধ্য হয়। এই অভিযান মাহদীর অনুসারীদেরকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করে এবং আলেকজান্দ্রিয়া লুন্ঠনের ফলে তাদের আর্থিক বুনিয়াদও চাঙ্গা হয়। এ সময়ে আব্বাসীয় খলিফার অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। তাদের ক্ষমতা দেহরক্ষী বাহিনীর মর্জির উপর নির্ভরশীল ছিল। কেবল জুমআর খুতবায় তাঁর নাম উচ্চারিত হোত। তাঁর নিয়োগ, অপসারণ এবং নিয়তি মূলত নির্ধারণ করত দেহরক্ষী বাহিনীর সেনানায়কের উপর। সমস্ত প্রদেশগুলির শাসন ভেঙে পড়েছিল। মিশরের অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়। মিশরের অবস্থা সম্পর্কে অলিয়ারী সাহেবের মন্তব্যঃ–

It was on the verge of disintergration by natural decay whilst the fatimid state which coveted it. Though outwardly strong and efficient, had already showed that it had the seeds of internal weakness in the tribal jealousies of berbers and Arabs _ page - 78.

মিশরে ২য় অভিযান ঃ

প্রথম অভিযানে ক্ষয়ক্ষতি এবং কিছু লাভ হওয়া সত্ত্বেও উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় মাহদী আবারও মিশর জয় করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এবার যুদ্ধের আয়োজন ছিল ব্যাপক এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে তিনি আক্রমণ পরিচালনা করেন। ৩০৭ হিজরীতে

www.waytojannah.com

বিশাল সেনাবাহিনী ৮৫টি যুদ্ধ জাহাজের বহর নিয়ে নবনির্মিত শহর মাহদীয়া থেকে যাত্রা করে। উপকূল দিয়ে এই নৌ-বহরটি অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ের সাথে অগ্রসর হতে থাকে এবং আলেকজান্দ্রিয়ার পোতাশ্রয়ে নোঙ্গর করে। দুর্বল বাগদাদের খলিফা তখন মুহাম্মাদ আবু মুনযির আল কাহির বিল্লাহ। তিনি মাত্র ২৫টি যুদ্ধ জাহাজ ও কিছু সংখ্যক সৈন্য দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার অভিমুখে প্রেরণ করেন। কিন্তু এবারে খলিফার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। এই যুদ্ধ জাহাজগুলি গ্রীক নৌ-সেনা দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। তারা অত্যন্ত দক্ষ এবং নৌ-যুদ্ধে অভিজ্ঞ ছিল। তাই মাহদীর বিশাল নৌবহরকে সাংঘাতিক আঘাত হেনে পরাজিত করে। যেহেতু মিশর এখন ফাতিমীয়দের আক্রমণ ও দখলের লক্ষ্যবস্তু সেহেতু মিশরের অবস্থা পর্যালোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও প্রযোজন। মিশর এ সময় গভর্ণর বা আমীর যুকা আর রুমী (Dhuka- or-Rumi) কর্তৃক শাসিত হচ্ছিল এবং এটা আব্বাসীয় খিলাফতের একটা প্রদেশ ছিল। যুকারুমীর প্রবল বাসনা ছিল যে কোন ভাবেই হোক ফাতিমীয় আগ্রাসনের কবল থেকে মিশরকে রক্ষা করতেই হবে। বিগত অভিযানের সময় ফাইউমে যেমন যুদ্ধ হলেও সেখান থেকে ফাতিমীয়দের বিতাড়িত করা হয়েছিল তেমনিভাবে প্রত্যেকটা অভিযান পথে সুরক্ষিত ব্যূহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন এটা তিনি গম্ভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি এ ব্যাপারে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয় এবং পরবর্তী আমির তেকিন আল খাসসা ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এ আমিরের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল মিশরের ব্যাপারে। কেননা তিনি ২৯৮ হিঃ থেকে ৩০৩ হিজরী পর্যন্ত শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেন এবং ফাতিমীয়দের প্রথম মিশর আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন। তিনি সেনাবাহিনী ও জনগণের খুবই প্রিয় ছিলেন। ফাতিমীয় অভিযানকে নস্যাৎ করে দেবার যাবতীয় কার্যকর ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করতে আদৌ ইতঃস্তত করেন নি। যদিও প্রাকৃতিক ও সমরকৌশলের দিক দিয়ে উত্তর নীল নদের প্রবাহে এবং বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চল এবং পার্বত্য ভূমিতে লুক্কায়িত গেরিলা ফাতিমীদেরকে সমূলে বিনাশ করা খুবই শক্ত ছিল তবুও তেকিন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি তাঁর অভিযানকে সফল করেন।

মিশরে ফাতিমীয় শিয়াদের অনেক দায়ী বা প্রচারক দল গুপ্তভাবে কর্মতৎপর ছিল। এখানে জনগণের মধ্যে তাদের সহানুভূতি ছিল। সাহায্যকারী গুপ্তচর এবং গোপন আক্রমণকারীও ছিল। মিশরের কাযী ও কোষাধ্যক্ষ ও কিছু উচ্চপদস্থ অফিসার মাহদীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। যদিও তাঁরা শিয়া ছিলেন না কিন্তু শাসকের সাথে মতানৈক্য ও ঈর্ষাকাতর হয়ে এমনটি করতেন। ঠিক এমন এক অভ্যন্তরীণ নাজুক পরিস্থিতিতে তেকিন পদচ্যুত হন। মুহাম্মদ বিন হামাল নতুন আমির হলেও তিন দিনের বেশী তিনি ক্ষমতায় থাকেন নি। তেকিন পুনর্বহাল হন কিন্তু প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে তেকিন আবার ক্ষমতা হারান। হিলাল বিন বদর এবং আহমদ বিন কাইঘ লাঘ পরপর শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। প্রথম জন ২ বৎসর এবং শেষজন ১ বছর ক্ষমতায় থাকার পর তেকিন ৩১২ থেকে ৩২১ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুকাল অবধি মিশরের সিংহাসনে থাকেন। মিশরে কেবলমাত্র উপযুক্ত সেনা সমর্থন ব্যতীত শাসন সম্ভব ছিল না। তেকিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু সেই সময়

www.waytojannah.com

সেনাবাহিনীতে খুবই বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। পিতার ন্যায় দক্ষ না হওয়ায় এবং উত্তেজিত সেনাবাহিনী বেতনের দাবীতে মুহাম্মদকে স্বল্পকালের মধ্যেই বিতাড়িত করে।

কোষাধ্যক্ষ মাদারাই অর্থ ঘাটতি ও হিসাবের অনিয়মের ঘাপলা এবং মাহদীর অনুরক্ত হওয়ায় অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে পড়ে। নিজের বিপদ আসন্ন ভেবে তিনি আত্মগোপন করেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও সুযোগ সন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন। রাজ্যে দারুন নৈরাজ্য বিরাজ করতে থাকে। লুঠতরাজ, হত্যা এবং দস্যুবৃত্তি চরমে উপনীত হয়। একে অন্যের সম্পদ হরণে যেন যুদ্ধ করার পূর্ণ প্রস্তুতির অপেক্ষায়। প্রশাসন জনগণের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। মিশরীয় জনগণের দৃষ্টি তখন বাগদাদের পরিবর্তে কায়রোয়ানের দিকে। যদিও কায়রোয়ানে ফাতিমীয়রা নির্মমভাবে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রেখে নিজেদেরকে দৃঢ় ও সবল হিসাবে পরিণত করে। ঠিক এমন এক অবস্থায় মিশর অবস্থান করছিল।

আব্বাসীয় খলিফা এ সময় মুহাম্মদ বিন তাঘুজকে মিশরের আমির নিয়োগ করেন। ইনি সিরিয়ার ইখশীদীয় গভর্নরের পুত্র ছিলেন এবং ৩১৮ হিজরী থেকে দামেস্কের আমির ছিলেন। তুর্কী বংশীয় মুহাম্মদ বিন তাঘুজকে আমির নিয়োগ করেও খলিফা নিশ্চিত ছিলেন না। কারণ সেই সময় বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নরগণ স্ব স্ব বংশীয় রাজত্ব কায়েম করে স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ২০৫ হিঃ-২৫৯ হিজরী খোরাশানের তাহিরীয় বংশ, ২৫৪ হিঃ-২৯০ হিজরী পর্যন্ত পারস্যে সাফফারীয় বংশ, ২৮৮ থেকে ৪০০ হিঃ পর্যন্ত ট্রানস অক্সিনা ও পারস্যে সামানীয় বংশ, মৌসুলে ২৯২ হিঃ ও আলেপেপাতে ৩৩৩ হিজরীতে হামদানীয় বংশ ৩৯৪ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করে। ইতিপূর্বে আগলাবীয় বংশ ও কায়রোয়ানে রাজত্ব করেছে। অনুরূপভাবে সিরিয়া ও মিশরে ইখশীদীয় বংশও বেশ কিছুকাল শাসন ক্ষমতা চালায়। এই ইখশিদীয় শাসনের সময়ই কায়রোয়ানে ফাতিমীয় খলিফা মাহদীর শাসন।

১ম ফাতিমীয় খলিফার রাজ্য শাসনের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও তিনি একজন প্রচন্ড উৎসাহী ও উদ্যমশীল শাসক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক লেনপুল সাহেবের মন্তব্য অত্যান্ত মূল্যবান। তিনি বলেনঃ- He held the throne for a quarter of a century and established his authority more or less continuously over the Arab and Berber tribes and settled cities from the frontier of Egypt to the province of Fez in Morocco, received the allegiance of the Mohammadan governor of Sicily and twice despatched expedition into Egypt, which he would probably have permanentey conquered if he had not been hampered perpetual insurrections in Barbary.১

মিশর বিজয় করার তাঁর প্রবল বাসনা ছিল। তিনি দুই বার আক্রমণ করেন কিন্তু আফ্রিকায় বার্বার গোত্রের বারংবার বিদ্রোহ ও ৯২৮-২৯ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং প্লেগের কারণে তাঁর সেনাবাহিনীকে মিশর থেকে ফিরিয়ে আনতে হয়।

মাহদীর ধর্মীয় অনুভূতি ও আন্দোলনের প্রতি জনগণের যতটুকু শ্রদ্ধা বা ভক্তি ছিল তাঁর থেকে তাঁর সেনাবাহিনীর বর্বর ও নিষ্ঠুর আচরণের জন্য ভয় ছিল অনেক বেশী। বার্বার

১ S. Lane Poole-A history of Egypt under the sara cens. P-96

www.waytojannah.com

গোত্র তাদের কল্পিত ও প্রচারিত অলৌকিক শক্তি ও কর্মকান্ডের নজীর দেখতে চাইলে তাদেরকে ভীষণভাবে প্রতিহত করা হয়। ফলে, উবায়দুল্লাহ আল মাহদীর সেনাপতিদের নৃশংসতায় বার্বার গোত্রগুলি সদা শঙ্কিত ও আতঙ্কিত থাকত। আবু আব্দুল্লাহ আশ শীঈর প্রতি তারা বিশেষ অনুরুক্ত এবং তাঁর হত্যাকান্ডে তারা বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মাহদীর সেনাবাহিনীর নিষ্ঠুর ও নির্মম অত্যাচারে তারা বাধ্য হয় কিছু সময়ের জন্য শান্ত থাকতে।

আল মাহদী ফাতিমীয়দের জন্য একটি স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠিত করে যে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন, আলী বংশের জন্য তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। মরক্কো হতে মিশর সীমানা পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ আফ্রিকা ভূখন্ডে ফাতিমীয়দের পতাকা সমুন্নত রাখার পর তিনি ৩২২ হিজরীতে ৯৩৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

৩৩২—৩৩৪ হিঃ
৯৩৩—৯৪৬ খ্রীঃ

আবুল কাসিম মুহম্মদ নিযার আল কাইয়িম বি আমর আল্লাহ

আবুল কাসিম ২৭৫ হিজরীতে সালামিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা উবায়দুল্লাহ আল মাহদী পুত্রকে শিক্ষা দীক্ষায় বিশেষ করে সামরিক কলাকৌশল শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শী করে তোলেন। শিয়া মতকে কিভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার জন্য সবিশেষ তা'লীম দেন। ফলে পিতার মৃত্যুর পর তিনি ৯৩৩ সালে ৪৭ বছর বয়সে আল কাইয়িম উপাধি নিয়ে দ্বিতীয় ফাতেমীয় খলিফা হিসেবে কায়রোয়ানের শাসনভার গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক লেনপুল তাঁর সিংহাসন আরোহণকালের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—He began his reign with warlike vigour. তিনি তাঁর পিতার শাসনামলেই সমরবিদ হিসেবে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। মিশরে যে দুটি অভিযান প্রেরিত হয় তা তাঁর রণদক্ষতা ও সেনাবাহিনী পরিচালনায় যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে।

ক্ষমতা লাভ করেই প্রথমতঃ তিনি উত্তর আফ্রিকার বার্বার গোত্রের গোলযোগ দমন করেন। বার্বারগণ এ সময় সমগ্র মাগরিবে এক চরম বিদ্রোহাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করে। সর্বত্র গোলযোগ আর বিশৃঙ্খলা বিরাজ করতে থাকে। আল কাইয়িম অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করে সব বেআইনী তৎপরতা বন্ধ করে দেশে পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করেন।

আল কাইয়িম সিংহাসনে আরোহণ করেই যুদ্ধের দিকে মনোনিবেশ করেন। প্রথমতঃ, দক্ষিণ ফ্রান্সের জেনোয়া উপকূলে ও কালাবারিয়ায় অভিযান প্রেরণ এবং দ্বিতীয়তঃ মিশরে সামরিক বাহিনী প্রেরণ। প্রথম অভিযানে বেশ কিছু সফলতা এবং গণীমত লাভ করলেও দ্বিতীয় অভিযান ফলপ্রসূ হয়নি। ৯৩৪–৩৫ সালে নৌবাহিনী প্রেরণ করে ১ম অভিযানের সূত্রপাত করেন। উপকূলীয় বন্দর ও জাহাজ লুঠ, অগ্নিসংযোগ এবং বিস্তর সম্পদ ও ক্রীতদাসদাসী অপহরণ এই অভিযানের সাফল্য।

তাঁর মিশর অভিযানের লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ মিশর জয় করে আফ্রিকায় ফাতেমীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তা সফল হয়নি। কারণ এ সময় ইখশিদীয়রা মিশরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করছিল। শান্তি–শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের উন্নতি, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দুর্বল আব্বাসীয়দের সম্মানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ইখশিদীয় শাসকের অবদান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল।

আল কাইয়িম প্রেরিত ফাতেমীয় বাহিনীকে পরাভূত করার জন্য মিশরের আমীরের ভাই উবায়দুল্লাহ ১৫০০ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মুকাবিলা করেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় ফাতেমীয় বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন এবং কায়রোয়ানের দিকে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। এই সময় ইখশিদীয়রা কেবল মিশর, সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন ছিল তাই নয়, খলিফা তাদেরকে মক্কা–মদীনার কর্তৃত্বও অর্পণ করেন। ফলে জনসাধারণের নিকট তাদের

www.waytojannah.com

মর্যাদা ও ক্ষমতা অত্যন্ত সম্মানের সাথে বিবেচিত হোত। মিশরে আল কাইয়িমের ব্যর্থতার যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তার থেকে আরো দগদগে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করে গোটা মরক্কো, বার্বার অধ্যুষিত অঞ্চল ও তিউনিসিয়াতে।

আরুস ও জাবের জিনাতা গোত্র (দক্ষিণ কাতামা অঞ্চল) এবং এর আশেপাশে খারেজীরা প্রবল আকারে বিদ্রোহের দামামা বাজিয়ে দেয়। এদের নেতা ছিলেন আবু ইয়াজিদ, যিনি শাইখুল মুসলেমীন উপাধি ধারণ করেন। (Shaikh of the true believers) তবে তিনি The man with an ass. গাধার সাথী মানুষটি, নামেই অধিক পরিচিত।

এই আন্দোলনটি মূলতঃ ছিল একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। কেননা ইতিপূর্বে যে জনপদ বিজয়ের সময় বার্বারদের অবদান ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য অথচ সরকার বা রাষ্ট্রপরিচালনায় আরবদের অংশ ছিল সিংহ ভাগ। এজন্য তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। এবার আবার যখন নতুন করে ফাতেমীয়রা ক্ষমতা দখল করল তখনও তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোল না। তাই তাদের এই আন্দোলনটি ছিল তাদেরই দেশে তাদেরই ভূখণ্ডে যারাই শাসন কার্য পরিচালনা করবে সেখানে তাদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা থাকবে মুখ্য।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে ৩৩২ হিজরীতে আবু ইয়াজিদ জিনাতা গোত্র ও বার্বারদের নিয়ে বিশাল এক সেনাবহর গড়ে তোলেন। অত্যন্ত গণজোয়ার সৃষ্টি করে উদ্দীপ্ত সেনাবাহিনী নিয়ে আবু ইয়াজিদ দ্রুতগতিতে বাঘাই, তাবাসসা, মারমাজুনা এবং লারিবাস দখল করেন। অবশ্য এসব রন অভিযানে ফাতেমীয়রা নীরবে বসে ছিলেন না। এই অগ্রযাত্রাকে বাধা দিতে ফাতেমীয় সৈন্যরা বাযাতে প্রতিরোধ করলে বিফল হয়। এই প্রবল অভিযান বেদুইন এবং বার্বার উপজাতিকে অভিন্ন স্বার্থে প্রণোদিত করে। তাদের স্বাধিকার আদায়ে জীবনপণ সংগ্রামী চেতনা যেন উপচে পড়ে। ফাতেমীয় বাহিনীকে পরাভূত করার ফলে জিনাতা গোত্র, আরুসের হাওয়ারাস গোত্র এবং আরো অনেকে আবু ইয়াজিদের নেতৃত্বে সমবেত হয়। বিশাল বাহিনী বেসামালভাবে কায়রোয়ানের দিকে প্রবল স্রোতসম ধাবিত হয়। এবার ফাতেমীয় সুশৃঙ্খল বাহিনীর নিকট আবু ইয়াজিদ পরাজয় বরণ করেন।

কিন্তু এই পরাজয়ে আবু ইয়াজিদ হতউদ্যম হননি। বরং পূর্ণ উদ্দীপনা নিয়ে আবারও সেনা সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শীঘ্রই নতুন বাহিনী নিয়ে রাকাদা দখল করেন এবং ফাতেমীয় বাহিনীকে পরাজিত করে কায়রোয়ান দখল করে এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। এ সময় আল কাইয়িম বাধ্য হয়ে কায়রোয়ান ছেড়ে আল মাহদীয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আবু ইয়াজিদ সাথে সাথে আল মাহদীয়ায় উপনীত হয়ে শহরটি অবরোধ করেন। এ সময় বার্বারদের বিরোধী কাতামা ও সানহাযা গোত্রদ্বয় ফাতেমীয়দের উদ্ধারে এগিয়ে আসে। বাধ্য হয়ে আবু ইয়াজিদের বাহিনী অবরোধ তুলে পিছনে চলে আসে। তাদের পিছনে হটে আসার সাথে সাথে আল কাইয়িম দ্রুত গতিতে সকল হৃত শহর ও অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করার সংকল্প ব্যক্ত করে গোটা তিউনিসিয়া তার অধিকারে আনতে সক্ষম হন। অবশ্য কৌশলগত দিক উদ্ভাবন করে আবু ইয়াজিদ ইত্যবসরে বিখ্যাত শহর সুসা অবরোধ করেন। আল কাইয়িম এ সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। অথচ আবু ইয়াজিদের প্রবল আক্রমণে তখনও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল ও জনপদ প্রকাম্পিত। যেন সমস্ত অঞ্চলে ফাতেমীয় শাসনের পতনের ঘন্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। খারেজিরা এক নতুন স্বপ্নে বহুদিনের লালিত বাসনার একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। আল কাইয়িম মূলতঃ একজন সৈনিক, সেনাপতি, সমরবিদ ছিলেন।

www.waytojannah.com

চতুর্থ অধ্যায়

৩৩৫–৩৪২হিঃ
৯৪৬–৯৫৩সাল

আবু তাহির ইসমাইল আল মনসুর বি আমর আল্লাহ

ফাতেমীয় খিলাফতের অস্তিত্ব যখন প্রবল হুমকির মুখে, রাজধানী আবু ইয়াজিদের বাহিনী কর্তৃক বিপদাপন্ন, বিখ্যাত নগরী সুসা অবরুদ্ধ, আঞ্চলিক অধিবাসীরা জাতীয়তাবাদী চেতনায় সমগ্রভাবে উদ্বুদ্ধ, চারিদিকে যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে আল মনসুর পিতা আল কাইয়িমের মৃত্যুর পর তৃতীয় ফাতেমীয় খলিফা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ক্ষমতাসীন হয়ে কেমন যোগ্যতা, দক্ষতা, সমরনিপুণতা এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ ক্রমাগতভাবে গ্রহণ করেন, এ অস্তিত্ববিনাশী হুমকির সার্থক মুকাবিলা করেন, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিক লেনপুলের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,— "It was only after seven years of uninterrupted civil war that this formidable insurrection died out, under the firm but politic management of the third caliph, el-Mansur (946-953), a brave man who knew both when to strike and when to be generous."১

খলিফা আল মনসুরকে সাতটি বছর কঠোর সংগ্রাম, তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর কুশলী উদারতায় এই জাতীয় সংকট মুকাবিলা করতে হয়। প্রথমতঃ এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি অবরুদ্ধ সুসা নগরী মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ শুরু করেন। প্রবল যুদ্ধের পর আবু ইয়াজিদের বাহিনী পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয় এবং বিতাড়িত হয় পশ্চিম আফ্রিকার দুর্গম কিনানা পার্বত্যময় অঞ্চলে। এখানেও তুমুল সংগ্রাম অব্যাহত থাকে পার্বত্য উপজাতি বার্বার গোত্রের দ্বারা। কিন্তু দীর্ঘ দিন যুদ্ধের পর তাঁর মৃত্যু হলে বিদ্রোহ দমন হয়। খারেজি নেতা আবু ইয়াজিদ মাখলাদ বিন কিরাদ একজন স্কুল শিক্ষক হয়েও যে বিস্ময়কর বিপ্লব করেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং ফাতেমীয় খিলাফতের জন্য পট পরিবর্তনযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

আল মনসুর আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে নিখুঁতভাবে অবহিত ছিলেন। কেননা তিনি কায়রোয়ানেই জন্মগ্রহণ করেন। ৩০২ হিজরীতে তাঁর জন্ম এবং ৩২ বছর বয়সেই আল মাহদীয়ায় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আবু ইয়াজিদের বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য প্রথমতঃ তিনি তাঁর যোগ্য সেনাপতি জাওহারকে প্রেরণ করেন। সেনাপতি জাওহার সুসা বন্দর অধিকার করেন। আবু ইয়াজিদ তানজিয়ারে আশ্রয় নিলে জিরি বিন মানাদ নামক সানহাজা গোত্রপতিকে আল মনসুর তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ৩৩৬ হিজরীতে কাতামা দুর্গে জিরি কর্তৃক আবু ইয়াজিদ পরাজিত হন শেষ

১. Lane Poole: A History of Egypt under the Saracens P.98

বারের মত। তবে তাঁর মৃত্যুর পর ৩৪১ হিজরী পর্যন্ত তাঁর পুত্র বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা বজায় রাখে।

এই বিপদ থেকে আবু তাহির ইসমাইল আল মনসুর বি আমর আল্লাহ ফাতেমীয় খিলাফত বা ইমামতকে রক্ষা করেন। আল মনসুরের স্বল্পকালীন রাজত্বকালের যে সাফল্য সে সম্পর্কে অলিয়ারী সাহেব বলেন : Al Man Sur's reign had been occupied entirely in dealing with Abu Yajids rebellion, and in consolidation of the country after this rebellion had been put down.

ইতিপূর্বে সিসিলিতে আরব উপনিবেশ স্থাপনকারীগণ ফাতেমীয়দেরকে আংশিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু আল মনসুর সিসিলির উপর পূর্ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত করে সেখানে ৩৩৯ হিঃ-তে আবুল কাসিম জামান বিন আলী বিন আবিল হোসাইন আল কালবীকে শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত করেন। সিসিলি প্রায় ১৮০ বছর এই হাসান পরিবার কর্তৃক শাসিত হয়। কালাব্রিয়াতেও মনসুরের নৌবাহিনীর আধিপত্য কায়েম ছিল। অবশ্য মৌরিতানিয়া এ সময়ে স্পেনের শক্তিমান শাসক আব্দুর রহমান আল নাসির কর্তৃক অধিকৃত হয়। মনসুর নিজের পছন্দমত একটি নতুন শহর নির্মাণ করেন—এটাই তার নামানুসারে আল মনসুরিয়া। একে তিনি রাজধানীরূপে পরিগণিত করেন। তাঁর শাসনকাল পর্যন্ত ফাতেমীয়দের স্থাপত্যকীর্তি বলতে মাহদীয়া, মুহাম্মাদীয়া, মনসুরিয়া প্রভৃতি শহর। তবে এখানে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো শিল্পকলা সাহিত্য গড়ে ওঠেনি। একমাত্র সিসিলিতে হাসান পরিবার এক উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা কেন্দ্র গড়ে তোলেন।

সাত বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে আল মনসুর মৃত্যুমুখে পতিত হন ৩৪২ হিজরীতে। তাঁর ভূমিকা ও কৃতিত্ব এটুকুই যথেষ্ট যে তিনি নিশ্চিত বিপদাপন্ন ফাতেমীয় খিলাফতকে পুনরুজ্জীবিত করেন। শুধু তাই নয়, এটাকে এক শক্তিশালী সম্মুখ পানে অগ্রসরমান খিলাফতে পরিণত করার পথ সুগম করেন। কেননা তখন আব্বাসীয় খিলাফতের শক্তি নানা কারণে দুর্বল। খলিফা আবুল কাসিম ফজল আল মুতী বিল্লাহ বাগদাদে তাঁর শক্তির উপর বিভিন্ন সদ্য স্বাধীন বংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের থাবা বিস্তার করে আছে।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই উদীয়মান শক্তিকে সুসংহত করা খুবই শক্ত ব্যাপার ছিল। কেননা প্রতিবেশী একটি ঐতিহ্যবাহী সুন্নী আব্বাসীয় খিলাফত, আর একটি ভূমধ্যসাগর পারে স্পেনের ঐশ্বর্যশালী উমাইয়া খিলাফত। এ দুটির প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল।

www.waytojannah.com

পঞ্চম অধ্যায়

৩৪২–৩৬৫ হিঃ
৯৫৩–৯৭৫ সাল

আবু তামিম মা আদ আল মুইজ লি–দীন–আল্লাহ

৩৪২ হিজরীতে আল মনসুরের মৃত্যুর পর তাঁরই সুযোগ্য পুত্র আবু তামিম মা আদ আল মুইজ লি–দীন–আল্লাহ উপাধি নিয়ে ফাতেমীয় চতুর্থ খলিফারূপে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেনঃ– Al-Muiz is described, even by historians inimical to his family, as a wise, energetic, and chivalrous soverign, an accomplished scholar, well versed in science and philosophy, and a munificent patron of arts and learning. He was unquestionably the Mamun of the west, and under him North Africa attained the highest pitch of civilisation, and prosperity. ১

আল মুইজ সম্পর্কে সৈয়দ আমীর আলী সাহেবের মন্তব্য খুবই উঁচু এবং গোটা ফাতেমী খিলাফতের গর্ব ও গৌরব–রূপে সত্যায়িত। মুইজ সম্পর্কে লেনপুল বলেন— With the fourth caliph, however, el Moizz the Conqueror of Egypt (953-975) the fatimids entred upon a new phase. He was a man of politic temper, a born Statesman able to grasp the conditions of success, and to take advantage of every point in his favour. He was also highly educated, and not only wrote Arabic poetry and delighted in its literature, but studied Greek, mastered Berber and sudani dialects and is even said to have taught himself slvonic ২

লেনপুল সাহেব যে দৃষ্টিতে আল মুইজকে দেখেছেন তা যথার্থ। কেননা ইতিপূর্বে কোন খলিফা সম্পর্কে এ ধরনের মূল্যায়নের অবকাশ ছিল না। ফাতেমীয় খিলাফতের সফল চিত্র মুইজ সম্পর্কিত উক্তিতে ধরা পড়ে।

ঐতিহাসিক অলিয়ারী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সংযত মন্তব্যে বলেনঃ–Cultured literary man as the Fatimid khalif was, he was also a most efficient, organizer, and was well served by officials whom he treated with generous confidence-৩

সংগঠক, শিল্প–সাহিত্যানুরাগী, সুশাসকরূপে আল মুইজের ক্ষমতা লাভ ফাতেমীয়দের জন্য স্মরণীয়। আমরা তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য দিকগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

আল মুইজ ৩১৯ হিজরীতে মাহদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যদিও কীর্তিমান ছিলেন তবুও পুত্রের সুশিক্ষাদান কার্যটি আদৌ অবহেলা করেননি। তিনি সতর্ক ও সযত্নে আল

১. Ameer Ali— A short history of the Saracens. P. 597 (ed-1961)
২. S. Lane poole— A History of Egypt----P. 98-99 (ed-1901)
৩. Delacy O'Leacy D D.— A short history of the fatimid-Khalfat page-98 (ed-1923

www.waytojannah.com

মুইজকে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা নয়, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার যাবতীয় বন্দোবস্ত করেন। পুত্রও তেমনি মনোযোগী মেধাবী পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী। ফলে পিতা পুত্রের কামনা ও লক্ষ্য অভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করে। তিনি ভাষাশিক্ষায় এত কৃতিত্বের পরিচয় দেন যে আরবী, বার্বার, সুদানী, প্রাচীন ইতালীয়, গ্রীক এবং স্লাভ ভাষাগুলি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেন। শিল্প সাহিত্যে যে মধুরস সঞ্চিত তা তিনি পুরা মাত্রায় পান করার যোগ্যতা ক্ষমতা ও মান অর্জন করেন। এ দিক দিয়ে তিনি প্রাচ্যের বাগদাদ আর প্রতীচ্যের কর্দোবার খ্যাতিমান বিদ্বান শাসকদের তুল্য। শুধু অক্ষরের মায়াবী জালে তিনি জড়িয়ে নিজেকে সুখী মানুষটিরূপে গড়ে তোলেননি। অস্ত্রবিদ্যায় সমরকৌশল সুনিপুণভাবে আয়ত্ত করে রণক্ষেত্রে তাঁর শক্তি, সাহস ও উদ্যমকে যথার্থ কাজে লাগানোর বিদ্যাটিও সযত্নে রপ্ত করেন। অসি ও মসীতে যখন তিনি পারদর্শী পুরুষ অর্থাৎ ২২ বছরের পূর্ণ যৌবনের অধিকারী, সেই সময় ফাতেমীয় খিলাফতের সিংহাসনটি তাঁকে পেয়ে বলতে গেলে ধন্যই হোল। অথচ তখন সমস্যা চারদিকে যেন ছড়িয়ে। মাটি, মানুষ, মন, অস্ত্র, অক্ষর, ইট পাথর আর আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন ইতস্তত অধীর হয়ে তাঁকে ডাকছে—সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে সঠিক বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে এখনই হাত লাগাতে হবে।

আল মুইজ তাঁর কর্মপন্থা স্থির করে ফেলেন। তাঁর কার্যক্রম নির্ধারিত করেন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপর। (ক) আল মাগরিবে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা (খ) স্পেনের শক্তিশালী শাসক আব্দুর রহমান আল নাসির অধিকৃত আফ্রিকীয় অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা (গ) ক্রীট ও সিসিলিতে ফাতেমীয় ক্ষমতা সুদৃঢ়করণ এবং তার জীবনের উল্লেখযোগ্য কীর্তি মিশর বিজয়।

প্রথমতঃ তাঁর এই কার্যগুলিকে সাফল্যের সাথে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন এক সুশিক্ষিত সুদক্ষ ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী, যারা স্থলে ও নৌপথে যুগপৎ সফল আক্রমণে অবিচল। এ লক্ষ্যে সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন। দূর্গগুলি পুনঃসংস্কার করেন। নতুন যুদ্ধজাহাজ নৌবহরে সংযোজিত করে এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তাছাড়া জনসমর্থন লাভের ও জনগণের আস্থা অর্জনের মানসে তিনি ফাতেমীয় শাসিত অঞ্চলগুলি ব্যাপক সফর করেন। জনগণ, জনকর্মচারী ও জনকর্মকর্তাদের চাহিদা ও অভিযোগ সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হন। তাদের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্বরিত গ্রহণ করেন। গোত্রপতি, উপজাতি প্রধান এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের আনুগত্য সুদৃঢ়করণে পদ, পুরস্কার এবং প্রয়োজনীয় উপঢৌকনে তুষ্ট করেন।

তার প্রাথমিক কার্যের পরও দেখা গেল যে, আল মাগরিবে অশান্তি ও বিদ্রোহাত্মক কার্যের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। সামরিক হস্তক্ষেপ ব্যতীত এই অশান্ত বার্বার গোত্রগুলিকে বশে আনা সম্ভব নয়। এই কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেন তাঁর দক্ষ সেনাপতি আবু হাসান জাওহার বিন আবদুল্লাহ। তিনি ছিলেন গ্রীক লিপিকার। ক্রীতদাসরূপে মনুসরের আমলে কায়রোয়ানে নীত হন এবং যোগ্যতাবলে তাঁর সচিবে উপনীত হন। "জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল" এই নীতিমালায় নিগ্রো, গ্রীক বা বর্ণ, জন্ম ও পেশায়

www.waytojannah.com

ভেদরেখা নিশ্চিহ্ন করে ইসলাম মানুষের প্রতিভার সর্বদা মর্যাদা দিয়েছে। ফলে বহু অখ্যাত অজানা মানুষ যোগ্য পরিচর্যায় বিখ্যাত মানুষে পরিণত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাওহার যেমন কুড়িয়ে পাওয়া মানিক তেমনি মিশরের সমকালীন উজ্জ্বল রত্ন কাফুর ও অমূল্য রতন। ইসলামের এই সাম্যবাদী মানব মূল্যায়নের নীতি সম্পর্কে অলিয়ারী সাহেব বলেন, There was no colour barrer nor any racial feeling no reluctance was felt at white men being ruled by a negro ex-slave.[১]

আল মুইজ সেনাপতি জাওহারকে ৯৫৮ সালে মরক্কোর বিদ্রোহী গোত্রগুলির বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সেনাপতি সিজিলমাছা ও ফেজে খলিফার কর্তৃত্ব নিরংকুশভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। পার্বত্য ইলাকা পদানত করে সুদূর আটলান্টিক তীরভূমি পর্যন্ত উপনীত হন। লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করে ফেজ ও সিজিলমাছার রাজপুত্র কন্যাদেরকে কায়রোয়ানে খলিফার দরবারে প্রেরণ করেন। শুধু তাই নয় গোটা ইফ্রিকিয়া যে, খলিফার অধিকারভুক্ত, নদী সাগর মহাসাগর তীর স্পর্শ করে যে ফাতেমীয় পতাকা উড্ডীন তার নিদর্শনস্বরূপ সেনাপতি জাওহার মৎস্যভর্তি পাত্র এবং সাগরজীব খলিফার দরবারে প্রেরণ করেন।

Jars of live fish and seaweed reached the Capital and proved to the caliph that his empire touched the ocean, the limitless limit of the world. All African littoral, from the Atlantic to the frontier of Egypt (with the single exception of spanish ceuta) now peaceably admitted the sway of the Fatimid caliph[২]

দীর্ঘ দিন অব্যাহতভাবে শাসকের সাথে লড়াই করে উপজাতিদের জনবল শক্তি মনোবল নষ্ট হয় এবং আল মুইজের উদারতা ও মহানুভবতায় তারা বেশ আশ্বস্থ হয়ে শান্তির পথে মাগরিবে যুদ্ধ বন্ধ করে।

স্পেনের শাসকের সাথে মুইজের সংঘর্ষ ঃ মুসলিম স্পেনে তখন আব্দুর রহমান আল নাসির লিদীনীল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি হিসেবে খৃষ্টানদের সাথে তুমুল যুদ্ধে ব্যাপৃত এহেন মুহূর্তে মুইজের সেনাপতি জাওহার মৌরিতানিয়া দখল করেন। এ সংবাদে বিচলিত হয়ে ৩৪৪ হিজরীতে আব্দুর রহমানের নির্দেশে আন্দালুসিয়ার নৌবহর মুইজের মাগরিবগামী জাহাজ আক্রমণ করে তারা এগুলি হস্তগত করেন। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সিসিলি অধিপতি হাসান বিন আলীকে নির্দেশ প্রদান করা হয় যেন তিনি অবিলম্বে স্পেনীয় নৌবন্দর আলমেরিয়া আক্রমণ করে তার ক্ষতি সাধন করেন। সেই সময় আব্বাসীয় খলিফা অসহায় এবং বস্তুতঃ ক্ষমতাহীন। তবে মুসলমানদের সৌভাগ্য যে আব্দুর রহমানের মত শক্তিশালী শাসক সমগ্র ইউরোপকে সন্ত্রস্ত করে রাখেন এবং মুসলিম সভ্যতার নব দিগন্ত উন্মোচন করেন।

অন্যদিকে আফ্রিকায় ফাতেমীয় খলিফা আল মুইজও শক্তি সঞ্চয় করে গৌরব শিখরে উপনীত হচ্ছিলেন। অথচ এরা উভয়ে সহযোগিতা ও সমঝোতায় না এসে পারস্পরিক শত্রুতায় লিপ্ত। এ দুঃখজনক অবস্থার মূল্যায়ন করে সৈয়দ আমীর আলী বলেনঃ–

১. De Lacy O'Leary DD-P-99
২. S. Lame Poole ---P.99-100

www.waytojannah.com

Henceforth the two Moslem sovereigns, instead of joining their forces for the conquest of Europe, wasted their strength in warring upon each other. ৩

ক্রীট ঃ স্পেন থেকে আগত মুসলমানেরা ভূমধ্যসাগরীয় এই দ্বীপটিতে এসে বসতিস্থাপন করে। ক্রমে ক্রমে তারা শাসন ভার গ্রহণ করে ২০৪ হিজরী থেকে। এ দ্বীপটিতে মুসলিম শিল্পকলা সংস্কৃতি ও সভ্যতা ইউরোপের ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। বাইজানটাইন শক্তিও দ্বীপটিকে গ্রাস করতে অভিযান চালায়। এদিকে বাগদাদের আব্বাসীয়, মিশরের ইখশিদীয়, সিরিয়ার হামদানীয়রা ক্রীট দখলের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ওদিকে স্পেনে উমাইয়াদের স্বার্থ তো সেখানে বিজড়িত। কিন্তু আল মুইজ ঠিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করে প্রত্যেকের দাবীকে নস্যাৎ করে ক্রীট দখল করেন। এই দ্বীপটি মিশর বিজয়ের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করাই তাঁর লক্ষ্য। এ দ্বীপটি ৩৫০ হিজরী পর্যন্ত ফাতেমীয়দের দখলে ছিল। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ দ্বীপটিতে ৩৫০ হিজরীতে বাইজানটাইনরা প্রবলভাবে আক্রমণ চালায়। ৭০০ নৌযুদ্ধজাহাজ এবং অগণিত সৈন্য নিয়ে দ্বীপটিতে অবতরণ করে। ক্রীটবাসীরা অসহায় অবস্থায় যুদ্ধ করে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বর্বর গ্রীকদের আক্রমণ এত নৃশংস ছিল যে, ঘর বাড়ী পুড়িয়ে কোলের শিশুকে ও ঘরের নারীদেরকে টেনে এনে হত্যা করে। একদা ঐশ্বর্যশালী ক্রীট যেন মুহূর্তের মধ্যে হত্যা ধ্বংস ও বিধ্বস্তের শ্মশানে পরিণত হয়। ক্রীট মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

সিসিলি ঃ প্রথম ফাতেমীয় খলিফা আল মাহদীর সময় থেকে সিসিলিতে আমীর আহমদ বিন হাসান শাসন করে আসছিলেন। আল মুইজের সময় ক্রীটের মত সিসিলিতেও বাইজানটাইন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। তারা সেখানে বেশ কটি স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে মুসলমানদের হয়রানী ও নির্যাতন করতে থাকে। আহমদ বিন হাসান বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ সময় গ্রীকদের সাহায্যের জন্য বেশ কটি জাহাজ বোঝাই সৈন্য সিসিলিতে আসে। শাসনকর্তা আহমদের প্রবল আক্রমণের মুখে তারা পরাজিত হয়ে জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করে। জাহাজগুলি পলায়নরত অবস্থায় আক্রমণ করে ডুবিয়ে দেয়া হয়। ৩৫০ হিজরীতে সমগ্র দ্বীপে ফাতেমীয় শাসন কায়েম হয়। ৪৮৪ হিজরী পর্যন্ত সিসিলি ফাতেমীয়দের অধিকারে থাকে, অতঃপর নরম্যানরা এটা দখল করে নেয়। মুসলিম শাসন আমলে সিসিলি খুবই উন্নত এবং সমৃদ্ধ ছিল।

Sicily has never been so prosperous as under the kalbite Ameers: mosques, collges, and schools sprang up on all sides: learning and arts were patronised, and the people prospered. The university of medicine at palermo rivalled those of Bagdad and Cordova. ১

উত্তর আফ্রিকা ক্রীট সিসিলির বিষয়গুলি আর আল মুইজের জন্য কোন দুশ্চিন্তার কারণ রইল না। এবার তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন মিশর বিজয়ের দিকে। মিশর বিজয় ফাতেমীয়দের বহুদিনের সাধ ও স্বপ্ন।

তাঁর পূর্বপুরুষদের যেমন বাসনা ছিল মিশর বিজয় করার এবং এ জন্য বেশ কটি

---

৩ Sayed Ameer Ali A short History of the Saracens-P.598
১ Sayed A meer Ali- A short History of the Saracens-P-599

www.waytojannah.com

অভিযানও প্রেরণ করা হয়েছিল তেমনি প্রবল আকাঙ্খা আল মুইজের কেমনভাবে মিশরে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ মরক্কো হতে মিশর পর্যন্ত যে বিস্তৃর্ণ অঞ্চল তা যেমন অর্থকরী নয়, তেমনি জনগণও দুর্বিনীত ও অশান্ত।

পাহাড় পর্বত, বনানী আর মরুভূমি শাসন করে উন্নত সভ্যতার সৃজন বা লালন খুবই কঠিন ব্যাপার। এজন্য সম্পদে সমৃদ্ধ জনবল ও সভ্যতার লালনভূমি মিশর বিজয় যেন ফাতেমীয়দের জন্য ছিল অপরিহার্য।

Egypt its weath, its commerec, its great port, and its docile population—these were his dream. [২]

মিশর বিজয়ের পটভূমি ঃ গ্রীক ও রোমানদের রাজত্বে মিশর ছিল প্রাচীন সভ্যতার লালন ভূমি। ইসলামের ইতিহাসের সাথে মিশর ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। হযরত ইবরাহীম, হযরত ইউসুফ, হযরত মুসা আর নমরুদ ফেরাউনদের কাহিনী নিয়ে মিশর যুগে যুগে অনেক অনেক কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। নীল নদ আর পিরামিডের দেশ মিশর। ফলে মুসলিম সভ্যতার বহুলাংশ জুড়ে মিশর গবেষকের নিকট উজ্জ্বল।

খোলাফায়ে রাশেদীনের ২য় খলিফা হযরত ওমরের (রাঃ) সময় হযরত আমর বিন আল আস কর্তৃক মিশর বিজিত হয় ৬৪০ সালে। খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের শাসনামলে মিশর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ হিসাবে পরিগণিত। মদীনা, দামেস্ক ও বাগদাদ এই উর্বর ভূমি হতে প্রচুর রাজস্ব সংগ্রহ করত। আব্বাসীয় খলিফাদের দূর্বলতার সুযোগে মিশরে স্বাধীন তুলুনীয় ও ইখশিদীয় বংশীয় শাসন চলে। আল মুইজ যখন ফাতেমীয় খলিফা তখন মিশরে ইখশিদীয় শাসন। ৩৩৫ হিজরীতে শক্তিশালী শাসক ইখশিদীয় মুহাম্মাদ বিন তুঘুজের মৃত্যু হলে তাঁর ১৫ বছরের পুত্র আবুল কাসিম আনজির শাসক হন। কিন্তু তার অল্প বয়সের সুযোগ নিয়ে আবুল মিসক কাফুর নামক এক কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস খোজা নিজ যোগ্যতা ও ক্ষমতাবলে রাজ্যের প্রশাসনের নিয়ন্ত্রক হন। তিনি পরবর্তী অবস্থাকে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে মিশরের শাসন ব্যবস্থাকে সঠিক রাখেন। ২২ বছর ধরে রাজ্যশাসনে মিশরবাসী তাঁর প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন ছিল। কাফুরের মৃত্যুর পর মিশর এক নৈরাজ্যে পতিত হয়। পরবর্তী শাসক মিশরকে শান্তি-শৃঙ্খলায় আনতে ব্যর্থ হয়। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র চরমে পৌছে। রাষ্ট্রের ট্রেজারীর বিপুল অর্থ আত্মসাৎ ও পাচার হয়। দেশে প্লাবন, অজন্মায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং প্লেগ ও মহামারীর ফলে মিশরে জনমনে হাহাকার বিরাজ করতে থাকে। দেশের মানুষ কোন অবস্থাতেই শাসকদের ভিন্নধর্মী আচরণে খুশী ছিল না। এমন অবস্থায় তারা চাইছিল একজন যোগ্য শাসক, যিনি জীবনের নিরাপত্তা, পেটের ক্ষুধাও ইজ্জতের হেফাজত করতে সক্ষম। বৈদেশিক যে-কোন হামলা প্রতিহত করার মত অবস্থা মিশরের ছিল না।

আল মুইজ বেশ কিছু সময় ধরে মিশরের অবস্থা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে অবলোকন করছিলেন। তাঁর আক্রমণটা ছিল কেবলমাত্র সময় এবং সুযোগের অপেক্ষায়।

২ S. Lane Poole-P. 100

www.waytojannah.com

It wascl ear that under these conditions the country would be in no condition to offer effective Resistance to an invade, and this was the moment chosen by the Fatimid khalif to make his attack.[১]

মিশরে নীলনদের অববাহিকায় ৯৬৭ সালে যে ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ ও মহামারী প্লেগ দেখা দেয় তাতে এক করুণ চিত্র ফুটে ওঠে। পুরাতন নগরী যা ছিল জনবহুল—প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, সেই নগরী ও তার আশেপাশে যে মৃতের লাশ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে তার আতঙ্ক ছিল বর্ণনাতীত। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ও প্লেগে ৬০০০০০ ছয় লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে, যা ছিল স্মরনাতীত কালের রেকর্ড। এ অসহায় অবস্থায় অনেকে ভিটেমাটি ছেড়ে জীবনের নিরাপত্তার তল্লাশে অন্যত্র পাড়ি জমায়।

মিশরে গোপনে ফাতেমীয় দায়ী বা প্রচারক দল ও গুপ্তচর বাহিনীও তৎপর ছিল। তাঁরা সময় মত সংবাদ আল মুইজকে সরবরাহ করতেন। সংবাদ পরিবেশকদের মধ্যে মধ্যমণি ছিলেন ইয়াকুব বিন কিল্লিস। ইনি একজন ইহুদি ছিলেন। পরে তাঁর মত পরিবর্তন করে কাফুরের খুবই বিশ্বাসভাজন ও অন্তরঙ্গ মিত্রে পরিণত হন। কাফুরের পর উজির ইবনে ফুরাত তাঁর প্রতি নাখোশ হয়ে তাঁকে বহিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মিশরের সঠিক সংবাদের বিশ্বস্ত সূত্র। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে বহু দিনের লালিত বাসনা পূর্ণ করার সুবর্ণ সুযোগ যেন আল মুইজের একান্ত অন্তরঙ্গ আঙ্গিনায়। তিনি প্রায় দু' বছর (৩৫৬–৩৫৭ হিঃ) ধরে মিশরে অভিযানের যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তার সমাপনী এখন সন্নিকটে। ৩৫৬ হিজরী হতে কায়রোয়ান থেকে মিশর পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ, কূপ খনন, সুবিধাজনক দূরত্বে বিশ্রাম নিবাস নির্মাণ এগুলি প্রায় সম্পূর্ণ। ব্যাপক অভিযানের জন্য যে প্রচুর অর্থ, রসদ,সৈন্য, বাহন, অস্ত্র ও জনবলের প্রয়োজন সেটার দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল তীক্ষ্ণ। মাকরিজীর বর্ণনা মতে ২৪০০০০০০ স্বর্ণমুদ্রা সংগৃহীত হয়। এক লক্ষ সৈন্যের বেতন, ভাতা, উপহার, উপঢৌকন, অশ্ব, উষ্ট্র ইত্যাদি প্রদান করে অভিযানের সকল দিক পূর্ণ করেন। কাতামা নেতাদের বিপুল অর্থ প্রদান করে তাদের অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করেন বাহন ও অস্ত্র নিয়ে অভিযানে যাত্রার জন্য।

এই ঐতিহাসিক অভিযানের জন্য আল মুইজ নির্বাচিত করেন সেনাপতি জাওহারকে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য। খ্যাতি, সাহস, বিচক্ষণতা, রণকৌশল, দক্ষতা এবং যুদ্ধ পরিচালনার ধীশক্তি জাওহারের ছিল অপরিমিত। ন্যায়সঙ্গত ভাবেই খলিফা তাঁর প্রতি ছিলেন দৃঢ় আস্থাবান। আর একজন সহযোগী ছিলেন এই অভিযানের, তাঁর নাম ইয়াকুব বিন কিল্লিস। বাগদাদের অধিবাসী। ধর্মে ইহুদি। পরে ইসলাম গ্রহণ। তাঁর পিতা তাঁকে প্রথমে সিরিয়া, পরে মিশরে প্রেরণ করেন। মিশরে তিনি কাফুরের অন্তরঙ্গতা এবং বিশ্বস্ততা অর্জন করে রাজ্যের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বও লাভ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময় ৩৫৬ হিজরী। কাফুরের মৃত্যুর পর তার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়। তিনি গোপনে পালিয়ে কায়রোয়ানে চলে আসেন এবং আল মুইজের ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে মিশর বিজয়ের পথকে ত্বরান্বিত ও সুগম করে দেন। তিনি সেনাপতি জাওহারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ কাজ করেন।

---

১ Delacy O.leary D D-A Shorh history of the Fatimid khalifate

www.waytojannah.com

মিশর অভিযান ঃ ৩৫৮ হিঃ ১০ই রবিউস সানী ৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সেনাপতি জাওহার বিপুল সমারোহে জাঁকজমকপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতায় মিশর অভিযানে যাত্রা শুরু করেন। যাত্রার মুহূর্তে খলিফার হস্তচুম্বন ও অশ্বের পদস্পর্শ করে তাঁর আশিষ কামনা করেন। খলিফার নির্দেশে রাজপুত্র, আমির–ওমরাহসহ সকল গণমান্য ব্যক্তিবর্গ অশ্ব থেকে অবতরণপূর্বক সেনাপতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কল্পে পদব্রজে কিছুদূর অগ্রসর হন। খলিফা তাঁকে বিপুলভাবে উপঢৌকনে ভূষিত করে বিদায় জানান। প্রাসাদে ফিরে তাঁর পরিধেয় বস্ত্র ও সীলমোহর ব্যতীত সবই সেনাপতিকে প্রদান করেন। এর ফলে সেনাপতির মর্যাদা সকল জনসাধারণ ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আর বিপুল উদ্যম ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সেনাপতি জাওহার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মিশর অভিমুখে যাত্রা করেন। সেনাপতি প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করলে অত্যন্ত নমনীয় শর্তে নগর অধিকৃত হয়। কোন হত্যা ধ্বংশ যজ্ঞ বা পীড়ন হয়নি। কেননা সেনাপতি তাঁর বেতনভুক সৈন্যদের শৃঙ্খলার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

জাওহারের মিশর অভিযানে ফুসতাত শাসকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। উজির ইবনে আল ফুরাত জনগণের জানমাল ইজ্জতের হেফাজত করার শর্তে সেনাপতিকে লিখবেন এটাই সিদ্ধান্ত হয়। সাথে সাথে জনৈক প্রখ্যাত আমির আবু জাফর বিন উবায়দুল্লাহ, যিনি আলীবংশীয়, তিনি স্বয়ং সেনাপতি জাওহারের নিকট গিয়ে জনগণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চাইবেন। সেইমতে প্রতিনিধি ১৮ই রজব ৩৫৮ হিঃ (১৮ই জুন ৯৬৯) আলেকজান্দ্রিয়ার অদূরে তারুজাতে সেনাপতি জাওহারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেনাপতি তাঁদের কথা শুনে নিঃশঙ্কচিত্তে সকল শর্তে সম্মত হয়ে একটি লিখিত নিরাপত্তানামা প্রদান করেন। ৭ই শাবানে প্রতিনিধিরা ফুসতাতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইবনে ফুরাত সেনাপতি লিখিত দলিল সকলের নিকট ব্যক্ত করেন এবং কিছু দিন ধরে আলোচনা চলতে থাকে। এদিকে অনেকে আসন্ন নতুন ফাতেমীয় শাসনে আপন আপন ভাগ্য খোলার অপেক্ষায়। তবে শেষ ইখশিদীয়রা আদৌ এমনভাবে পরাজয় মেনে নিয়ে মিশরকে আক্রমণকারীর হাতে তুলে দেবার পক্ষে ছিল না। তারা বাধা দিতে চাইল। সম্পদ লুকিয়ে রাখল। এদিক সাধারণ মানুষ দারুণ আতঙ্কে দিন কাটাতে লাগল। প্রতিরোধকল্পে মিশরীয় বাহিনীর নেতৃত্বকারী সেনাপতি নাহবীর মুইজাই গিজায় উপস্থিত হলেন সেতু প্রহরায়।

১১ই শাবানে সেনাপতি জাওহার মিশর সীমান্তে এসে শুনলেন প্রতিরোধ–অভিযানের কথা। কিছু খণ্ডযুদ্ধ হোল কিন্তু তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সেনাপতি জাওহার বীরবিক্রমে প্রতিরোধ বৃহ ভেঙ্গে ফুসতাতে প্রবেশ করার জন্য উদ্যত। এমন সময় আবু জাফর আবার এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করলেন ফাতেমীর সেনাপতি প্রদত্ত পূর্ব দলিলকে নবায়ন করার জন্য। সেনাপতি সদয় সম্মতি দিলেন পূর্ণ নিরাপত্তার। তিনি সকল গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী, শরীফ, পণ্ডিত এবং ব্যবসায়ীদেরকে গিজায় আসার অনুরোধ করেন।

www.waytojannah.com

একটি ঘোষণা সকলকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, উজির ইবনে আল ফুরাত ও শরীফ আবু জাফর ব্যতীত সকলে অশ্ব থেকে অবতরণ করে সেনাপতি জাওহারকে অভিবাদন জানাবেন। এই আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রতিনিধি বর্গ নগরে প্রবেশ করেন এবং সৈন্যরাও তল্পিতল্পাসহ নগরে প্রবশে করেন।

আসর ছালাত শেষে সেনাপতি জাওহার দন্দুভী বাজিয়ে পতাকা উড়িয়ে স্বর্ণতন্তু অলঙ্কৃত রেশমী পোশাকে আবৃত হয়ে ক্রীম কালার অশ্বে আরূঢ় হয়ে বিজয়ীবেশে ফুসতাত নগরীতে প্রবেশ করেন। নগরীর সোজা সড়ক দিয়ে ঢুকে উত্তর–পূর্ব কোণে তাঁবু স্থাপন করেন। সন্ধ্যার পর ১২০০ গজ চৌকোণাকৃতি রেখায় একটি নতুন নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। সেই সময় জ্যোতিষ বিজ্ঞানের গ্রহনক্ষত্রে শুভকর্মের নির্ধারণী নিয়মে যে নক্ষত্র উদিত হয় তারই নামে এই নতুন নগরের নামকরণ করা হয়। Mars বা মঙ্গলকে আরবীতে আল কাহির বলা হয়।

এটাকে আল কাহিরা আল মাহরুসাও বলা হয়। (মঙ্গলের প্রহরাধীন নগরী) আল কাহিরাই আজকের কায়রো নগরী—মিশরের রাজধানী। ফুসতাত পুরাতন আযব নগরী ২১ হিজরীতে নির্মিত। নতুন নগরীর গোড়াপত্তনের পর ধীরে ধীরে পুরাতন ফুসতাতের বসতি নতুন নগরে স্থানান্তরিত হয়।

ফুসতাতে জাওহার বাহিনীর প্রবেশ ও নগরবাসীর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাকে সকলে স্বস্তি ও উৎফুল্লের সাথে গ্রহণ করে এবং তারা আনন্দের সাথে যারা নতুন বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে আগ্রহী ছিল, তাদের অনেক নেতাকে হত্যা করে কর্তিত মস্তক জাওহারের নিকট প্রেরণ করে।

The Fatimide general entered the capital (Fostat) without opposition, and on the 15th of Shaban 358 A. H. read the khutba in the public mosque in the name of Muiz.[১]

এই নজীরবিহীন বিজয়ের শুভবার্তা সেনাপতি জাওহার খলিফা আল মুইজকে প্রদান করেন। খলিফার সাধ আর আশা এবার ষোলকলায় পূর্ণ হোল।

জাওহার এবার সুন্নী খিলাফতের যাবতীয় আনুষ্ঠানিক নিয়ম পদ্ধতি পরিবর্তন করার হুকুম জারী করলেন। পৌনে চারশত বছরের রেওয়াজ পদ্ধতি পাল্টে গেল। আব্বাসীয় খলিফার নাম খুতবা ও মুদ্রা থেকে মুছে ফেলা হোল। আব্বাসীয়দের সরকারী কাল বর্ণের পোশাকে পরিবর্তে সাদা পোশাকের প্রচলন হোল। মুদ্রায় ও খুতবায় আল মুইজের নাম উচ্চারিত হোল। আজানের বাড়তি শব্দ যুক্ত হোল হাই আলাল খাইরুল আমাল এবং এটা শিয়া পদ্ধতিতে প্রচলিত হোল। খুতবায় হযরত আলী ফাতিমাসহ সকল ইমামদের স্মৃতিচারণ করা হোল। মুদ্রায় লেখা ছাপা হোল–প্রতিনিধিদের মধ্যে আলীই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ নবীর উজির ইত্যাদি। শত শত বছরের মসজিদগুলিতে এখন সুন্নী শব্দের পরিবর্তে শিয়া শব্দ উচ্চারিত হোল।

জাওহারের অন্যান্য কাজ ঃ নগরের আইন–শৃঙ্খলা নিশ্চিত করলেন। প্রতি রোববার একটি আদালত স্থাপন করে জনগণের অভাব অভিযোগ এবং কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে নালিশ জানানোর কথাও ঘোষণা করে দিলেন। জাওহার নিজে কাযী ও আইনবিদদের নিয়ে আদালতের কার্যাদি করতেন। ৮ই জিলকদ শুক্রবারে

১. Ameer Ali. A Short History of the Saracens P. 599-600

www.waytojannah.com

খুতবাতে আরো নতুন কিছু কথা যুক্ত হোল ঃ

O my God, bless Muhammad the chosen, Ali the accepted, Fatima the pure, and al Hassan and al Husayn, the grand sons of the apostle whom thou hast freed from stain and thoroughly purified. O my God, bless the pure Imams; ancestors of the commanders of the faithful.[১]

তবে মিশরে ফাতিমীয় অনুসারীদের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না এবং শিয়া মতে দীক্ষিত হবার প্রবণতা ও লক্ষণীয় নয়। বরং সুন্নীদের আচার-অনুষ্ঠান পালন বেশ উৎসাহ সহকারে হোত। মহররমের সময় বেশ দাঙ্গা-হাঙ্গামাও লাগত।

মিশরের জনগণের জীবনযাত্রা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে এলেও অর্থনৈতিক দারুণ সংকট দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ তখনও চলছে। জনগণের হাহাকার চরমে। জাওহার এই খাদ্য সংকট মোচনের জন্য মুইজকে অবহিত করলেন এবং স্থানীয়ভাবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যারা ব্যবসায়ী তাদের শস্যাদি বাজারজাত করার নির্দেশ দেন যেন কেউ চড়া মূল্যের জন্য শস্য গুদামজাত না করে। আইন অমান্যকারীদেরকে প্রকাশ্যে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন। একটা কেন্দ্রীয় শস্যভাণ্ডার খোলেন। মুহতাসিবের সামনেই সকল শস্য উৎপাদনকারীকে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে শস্য বিক্রয়ের নির্দেশ দেন। আল মুইজও বেশ কিছু জাহাজভর্তি শস্য প্রেরণ করেন। তবুও ছ বছর যাবৎ এই দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। জনগণের মৃত লাশের সংখ্যা এমন বৃদ্ধি পায় যে মৃত্যুর সাথে সাথে কাফন দাফন করা সম্ভব হয়নি। অনেক লাশ নীল নদে ভাসিয়ে দেয়া হয়। তবে জাওহারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দু' বছরের মধ্যেই শস্য উৎপাদন ও আমদানী উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ৯৭১-৭২ সালে দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হয় এবং মহামারী প্লেগও চলে যায়।

জাওহার শাসনকার্যে ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক দৃষ্টি দেন। প্রতিটি বিভাগের কার্যাদি সুষ্ঠু ও নিয়মমাফিক পরিচালনার জন্য মিশরীয় ও মাগরিবী যোগ্য দক্ষ অফিসার নিয়োগ করেন। তাঁর আন্তরিক ও দৃঢ় প্রচেষ্টায় মিশরে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেনাপতি জাওহার আল কাহিরা নগরী অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করেন। দক্ষ অভিজ্ঞ কারিগর প্রকৌশলী দিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ইমারত নির্মিত হয়। আল আজহার মসজিদ, সেনা ছাউনী, বাজার, সরকারী বাসভবন,ইত্যাদি, সুবিন্যাসে আলকাহিরা শীঘ্রই নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে। এই বিশাল নগরীর চতুর্দিকে পুরু ইটের পুরু প্রাচীর দিয়ে বেষ্টনী দেয়া হয়। এই বেষ্টনী ঐতিহাসিক মাকরিজী ১৪০০ সালেও প্রত্যক্ষ করেছেন বলে তাঁর বর্ণনায় উল্লেখিত। এই বেষ্টনীর মধ্যভাগে উন্মুক্ত চত্বর। মূলতঃ দুই প্রাসাদের মাঝে এ স্কয়ার। দশ হাজার সৈন্য সহজেই এখানে প্যারেড করতে পারে। এই বিশাল চত্বরের ক্ষুদ্রাংশ এখন 'সুক আল নাহমিন' নামে পরিচিত। পূর্ব প্রান্তে খলিফা ভবন। এর এক কোণায় হোসাইনী মসজিদ ও খান খালিলী বর্তমান।

পশ্চিম প্রান্তে আল মুইজের উত্তরসূরীরা আরও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এ স্থলে কাফুর নির্মিত একটি সুন্দর বাগিচা ছিল যা অক্ষতভাবে ফাতিমী খলিফাগণ রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আল কাহিরার মধ্য দিয়ে একটি প্রশস্ত সড়ক নির্মিত। দক্ষিণে বাব আল

---

১. De Lacy O. Leary P-104

www.waytojannah.com

জাওয়ালা থেকে উত্তরে বাব আল ফুতুহ পর্যন্ত বিলম্বিত। এ সড়কটি পুরাতন নগর ফুসতাতের সাথে সংযুক্ত। খলিফার প্রাসাদের পাশেই উজিরের প্রাসাদ এবং এর দক্ষিণে বিখ্যাত আল আজহার মসজিদ। ৯৭০ সালে সেনাপতি জাওহার এই ঐতিহ্যবাহী মসজিদের নির্মাণ শুরু করেন এবং ৯৭২ সালের ৭ই রমজানে এর নির্মাণকার্য শেষ হয়। এটা যেমন মসজিদ তেমনি এটা ফাতিমীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির লালনক্ষেত্র।
ইমারতগুলি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে নির্মিত হয় শিয়া আকিদা পরিচিতির লক্ষ্যে। স্তম্ভ, গম্বুজ, মিনার, খিলান ইত্যাদি এক প্রাচীন পারস্যরীতি ভিন্নভাবে মিশরে নবজন্ম লাভ করে। আল কাহিরার প্রাচীর নির্মাণ সমাপ্ত হয় ৩৫৯ হিজরীতে। পুরাতন নগরী বাণিজ্য কেন্দ্র এবং বেসরকারী মানুষের আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়।
৩৬১ হিজরীতে বাশমুর জিলায় ইখশিদীয় একজন অফিসার বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তা দমন করা হয় এবং তাকে ধাওয়া করে প্যালেস্টাইনে ধরা হয় এবং অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে তার মৃতদেহকে ঝুলিয়ে রাখা হয়, যেন পরবর্তীতে আর কেউ এ ধরনের কাজে সাহস না পায়।
৩৫৫ হিজরীতে নিউবিয়ানরা একবার মিশর আক্রমণ করে। ৩৬২ হিজরীতে জাওহার নিউবিয়ার খ্রীষ্টান শাসক রাজা জর্জের দরবারে দূত প্রেরণ করেন ইসলামের দাওয়াত দিয়ে। দূতকে সাদরে গ্রহণ করেন, কিন্তু রাজা ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবে করদানে স্বীকৃত হন। মিশর কোন সময়ই সিরিয়ার ব্যাপারে উদাসীন ছিল না। প্রাচীন, মধ্য এবং তৎকালে সর্বদা সিরিয়ার সাথে তার একটা সম্পর্ক ছিল। ইখশিদীয় আমলে সিরিয়ার একটা অংশে তারা প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই সময় আলেপ্পোতে শিয়া কর্তৃত্ব ছিল এবং ইখশিদীদ হোসাইন মিশরের উজির ইবনে ফুরাতের নিকট হতে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে সিরিয়ার রামলাতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সেনাপতি জাওহার জাফর বিন ফিল্লাহর অধীনে একদল সেনা প্রেরণ করেন। যুদ্ধে পরাজিত ও ধৃত হয়ে হোসাইনকে মিশরে অত্যন্ত অপমানিত এবং অপদস্থ অবস্থায় ইবনে ফুরাতের সামনে হাজির হতে হয়। অতঃপর তাঁকে ইফ্রিকিয়ার এক কারাগারে প্রেরণ করা হয় এবং ৩৭১ সালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

কারমাতিয়দের সাথে সংঘর্ষ : হোসাইনকে পরাজিত করে জাফর উত্তরে অভিযান অব্যাহত রাখেন এবং দামেস্ক দখল করেন। দামেস্ক দখলের পর কারমাতিয়দের সাথে ফাতিমীয়দের সংঘর্ষ বাধে। এই সময় কারমাতিয়দের নেতা ছিলেন হাসান আল আসলাম। তিনি ফাতিমীয়দের চরম বিরোধী এবং ঘোর শত্রু ছিলেন। হাসান এক বিশাল বাহিনী নিয়ে দামেস্ক আক্রমণ করে তা দখল করেন। এই দখলের পর আল মুইজের প্রতি প্রকাশ্য অভিশাপ প্রদান করে দামেস্কে বিজয় উৎসব পালিত হয়।
হাসান দ্রুতগতিতে দামেস্ক দখলের পর রামলায় উপনীত হন এবং সরাসরি মিশর দখলের জন্য প্রস্তুতি নেন। তাঁর অভিযানের ফলে কুলজুম এবং ফারমো (আল আরিশ) এবং সমগ্র সুয়েজ এলাকা তাঁর অধীনস্থ হয়। অতঃপর তিনি আইন আস শামসে (হলিওপলিস) উপস্থিত হয়ে মিশর আক্রমণ করেন। আইন আশ-শামসে হাসানের

www.waytojannah.com

উপস্থিতি জানবার পর জাওহার আল-কাহিরার সামনে পরিখা খনন করেন। এ সময়ে জাওহারের পুরাতন শত্রুদের একটা সুযোগ আসে এবং তারা গোপনে সেটা ব্যবহার করে। এমনকি ইবনে ফুরাতের গতিবিধির উপর গুপ্তচর বসানো হয়। হাসান অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ের সাথে নগর আক্রমণ করেন, কিন্তু নগররক্ষীদের প্রতিআক্রমণ ব্যূহ ভেদ করে পরিখা অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি, বরং তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। এই সময় হাসানকে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয় এবং বাধ্য হয়ে তাকে কুলজুমে প্রত্যাবর্তন করতে হয়।

হাসানের মিশর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে আল মুইজ ইবনে আম্মারের অধীনে উপযুক্ত সাহায্য প্রেরণ করেন। খলিফা প্রেরিত সাহায্যপুষ্ট হয়ে জাওহার হাসানের পশ্চাদ্ধাবন করেন। এ সময়ে হাসানের সাহায্যার্থে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজ নীল নদে অবস্থান করছিল। সেগুলি আক্রমন করা হয় এবং ৭টি জাহাজ এবং ৫০০ সৈন্যকে বন্দী করে হাসানকে বিতাড়িত করা হয়। হাসান দামেস্ক উপনীত হয়ে পুনরায় মিশর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। এই সময় সেনাপতি জাওহার গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, কালবিলম্ব না করে খলিফা আল মুইজের মিশরে আগমন অত্যাবশ্যক। শুধু আগমন নয়, রাজধানী কায়রোয়ান থেকে কায়রোতে স্থানান্তর প্রয়োজন।

আল মুইজের মিশর আগমন ঃ ইফ্রিকিয়াতে প্রায়ই বিদ্রোহ লেগে থাকত। বনু জানাতা গোত্র খারেজী নেতা মুহাম্মদ ইবনে খিজিরের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহকে তিনি দমন করেন সানহাজা গোত্রপতি জিরি বিন মানাদের পুত্র বুলকিনের দ্বারা। বুলকিন অত্যন্ত সাফল্যের সাথে পিতার ন্যায় সমর কুশলতা প্রদর্শন করে এ বিদ্রোহ দমন করেন। আল মুইজ উত্তর আফ্রিকার সামরিক প্রশাসনিক সমস্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে তার আর মিশর গমন বিলম্ব করা উচিত নয় এবং এই অঞ্চলের শাসনভার বুলকিনের উপর ন্যস্ত করলে কোন প্রকারের আশঙ্কার কারণ থাকবে না। কায়রোয়ান ত্যাগ করার প্রাক্কালে বুলকিনকে শাসন কর্তা নিয়োগ করে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেন। তা হোল—বেদুইন আরবদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেবে, বার্বারদের প্রতি তলোয়ার সর্বদা উম্মুক্ত রাখবে, কখনও কর্তৃত্বপূর্ণ পদে আপন ভাইকে বসাবে না, কেননা তারা তোমার পদের অংশীদারিত্ব দাবী করবে। নগর ও শহরবাসীদের প্রতি সদাচরণ করবে।

কায়রোয়ান থেকে যাত্রা করে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ সারদীনা ও সিসিলি সফর করেন। অতঃপর লিবিয়ার ত্রিপোলী হয়ে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে উপস্থিত হন। তাঁর এই সফরে বিখ্যাত কবি ইবনে হানি ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ইয়াকুব বিন কিল্লিস সাথী ছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়াতে ফুসতাতের এক গণ্যমান্য প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ পান, যার নেতৃত্বে ফুস্তাতের কাযী ছিলেন। আল মুইজের সংলাপ ও আচরণে তাঁরা বিমুগ্ধ হন। এক মাস পর সেখান থেকে তিনি শহরে অর্থাৎ আল কাহিরায় প্রবেশ করেন, যদিও তাঁর সম্মানে পুরাতন ফুসতাত নগরী আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়, তথাপিও তিনি সেখানে অবস্থান না করে স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা স্বজন ও আমীর ওমারাহসহ নবনির্মিত

www.waytojannah.com

খলিফার প্রাসাদে উপনীত হন। এখানে আগমনকালে তিনি তাঁর পূর্বসূরী তিনজন খলিফার কফিন সাথে করে আনেন এবং তা দুটি হাতীর পিঠের উপর প্রথম সারিতে রেখে রাজকীয় সম্মান প্রদান করেন।

তার পর ঈদুল ফিতরের দিন নবনির্মিত আল আজহার মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করেন। অতঃপর পূর্ণ শান শওকত ও মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে তিনি রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করেন। তবে খুববেশী দিন তিনি নতুন নগর আল কাহিরায় শান্তিতে অবস্থান করতে পারেননি। দুর্বিনীত কারমাতিয়রা আবার মিশর অভিযান শুরু করে। কারমাতিয়দের সাথে সন্ধির চেষ্টা করে হাসানকে একটা পত্র দেন আল মুইজ। পত্রের উত্তর নিম্নরূপ I have received thy letter, full of words, but empty of sense : I will bring my answer.১

কারমাতিয়দের পুনঃআক্রমণ ঃ ৩৬৩ হিজরীতে কারমাতিয়রা আবার মিশর আক্রমণের জন্য আইন আশ শামসে হাজির হয়। খলিফাপুত্র আব্দুল্লাহকে ৪০০ হাজার সৈন্য দিয়ে পাঠালেন। আর হাসানের সেনাবাহিনীতে বনি তাই গোত্রকে স্বপক্ষে আনবার জন্য আল মুইজ তাদেরকে এক লক্ষ দিনার উৎকোচ প্রদান করেন। এই উৎকোচ বেশ ফল দেয়। যুদ্ধে তারা হাসানকে সাহায্য করেনি। ফলে বিপক্ষ দলের তীব্র আক্রমণে হাসান পরাজিত হয়ে যান। তাঁর তাঁবু লুঠ করা হয় এবং ১৫০০ সৈন্যকে হত্যা করা হয়। এ পরাজয়ের পর কারমাতিয়রা আন্তকোন্দলের ফলে আর একত্রিত হতে পারেনি। এরপর হাসান আল আসলাম মৃত্যুমুখে পতিত হন। বাহরাইনে তাঁর রাজ্যও আর ভালভাবে চলেনি। ফলে ফাতিমীয়দের বশ্যতা স্বীকার করতে তারা বাধ্য হয়।

হাফতকীনের সাথে সংঘর্ষ ঃ কারমাতিয়দের মুকাবিলা করার পর হাফতকীনের সাথে আল মুইজকে শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। হাফতকীন বুয়াইদ সুলতান মুইজ-উদ-দৌলার তুর্কী ক্রীতদাস থেকে যোগ্যতাবলে সেনাবাহিনীতে অফিসার পদে উন্নীত হন। মুইজ-উদ-দৌলার পুত্র আজ-আদ-দৌলার সময়ে তিনি সেনাদলের নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তুর্কী ও দাইলামীদের সাথে বাগদাদের বাইরে এক সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতায় মাত্র ৪০০ অনুগামী নিয়ে আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করতে বাধ্য হন। প্রথমে ফুরাত কূলে রাবহাতে আশ্রয় নেন এবং পরে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেন। তাঁর আগমনে সিরিয়াতে আরবরা শঙ্কিত হয়ে ফাতিমীয় শাসক ইবনে জাফরের সাহায্য কামনা করে। শাসনকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু আলেপেপা থেকে প্রেরিত সাহায্য পেয়ে হাফতকীন বেশ সুবিধাজনক অবস্থান নেন। পরে হাফতকীন আলেপেপাতে আমন্ত্রিত হন কিন্তু সিরিয়ার অবস্থা তাঁর অনুকূলে হওয়ায় তিনি দামেস্ক দখল করেন। কারমাতিয়দের সাথে সমঝোতা করে হাফতকিন সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি দখলের অভিযান শুরু করেন। এ সময় ফাতিমীয় বাহিনী খুবই নাজুক অবস্থায় পতিত হয়। ঠিক এমন এক সংকটময় মুহূর্তে আল মুইজের মৃত্যু হয়।

---

১ DE Lacy O'Leary - P.111

www.waytojannah.com

আল মুইজের শাসন ব্যবস্থাঃ

প্রধান সেনাপতি (সামরিক বাহিনী)

আল মুইজের শাসনকালে সামরিক অভিযানের সাফল্য মূলতঃ সেনাপতি জাওহারের কৃতিত্বে নির্মিত। এই যোগ্য সেনাপতি যেমন আন্তরিকভাবে ফাতিমীয় শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করেছেন তাতে কেবলমাত্র ফাতিমীয় দায়ী আবু আব্দুল্লাহ আল-শীঈর সাথেই তাঁকে তুলনা করা যেতে পারে। আবু আব্দুল্লাহ আশ-শীঈ যেমন ফাতিমীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন ঠিক তেমনি জাওহার ফাতিমীয় খিলাফতের ভিত্তিকে সুদৃঢ় এবং প্রতিপত্তি সম্প্রসারিত করে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

জাওহারের প্রভাব এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় উত্তর আফ্রিকায় বার্বার ও খারিজী বিদ্রোহ দমনে, সিসিলিতে ফাতিমীয় ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠায় এবং সফল মিশর বিজয়ে। স্পেনে উমাইয়াদের সাথে শক্তি পরীক্ষায়ও তাঁর কৃতিত্ব অনন্য। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান যা যুগ যুগ ধরে সকলের নিকট স্মরণীয় তা হোল কায়রো নগরী এবং বিখ্যাত আল আজহার মসজিদ ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। ফাতিমীয়দের প্রতি অবিচল বিশ্বস্ততা এবং দ্ব্যর্থহীন আনুগত্য তাঁর কার্যপ্রণালী বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। সুদীর্ঘ চার বছর ধরে আল মুইজের মিশর আগমনপূর্ব পর্যন্ত বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত মিশরকে তিনি আইনের শাসনে এনে জনগণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানে সক্ষম হন এবং মিশরকে সার্বিকভাবে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যান। অতঃপর খলিফার উপস্থিতিতে তিনি মিশরের সকল দায়িত্ব অর্পণ করে খলিফার আদেশ মান্য করে পরবর্তী কার্যক্রমে আত্মনিয়োগ করেন। ফাতিমীয়দের প্রতি অনুগত থেকেই পরবর্তী খলিফা আল-আজিজের সময় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন ৩৮১ হিজরীতে।

জিরি বিন মানাদ, বুলকিন বিন জিরি বিন মানাদ, জাফর বিন ফালাহ প্রভৃতি নামগুলি ফাতিমীয় সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত গৌরব এবং গর্বের। সেনাপতি জাওহারের সহযোগী হিসাবে এঁরা সকলেই ফাতিমীয় রাষ্ট্র বিপদমুক্ত করণে ও সীমানা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। বস্তুতঃ এঁরাই শক্তির স্তম্ভ হিসাবে কাজ করেন।

স্থলবাহিনীর সাথে সাথে নৌবাহিনীর ভূমিকাও ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। ফাতিমীয়দের দ্বিতীয় রাজধানী মাহদীয়া মূলতঃ একটি নৌঘাটি। ভূমধ্যসাগরে ফাতিমীয় কর্তৃত্ব স্থাপনে নৌবাহিনীর সাফল্য এবং কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ। মিশর বিজয়ে নৌবাহিনীর ভূমিকাও প্রশংসনীয়। তাছাড়া বাণিজ্য সম্প্রসারণে নৌপথে ফাতিমীয় জাহাজগুলি এবং নৌ-বন্দরগুলিও বণিকদের খুবই সহায়ক ছিল। সিরীয় বন্দর, আলেকজান্দ্রিয়া, ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর ও নীল নদে ফাতিমীয়দের আধিপত্য সামরিক বেসামরিক উভয় দিক দিয়ে ছিল অপ্রতিরোধ্য। স্থলে ও নৌপথে উত্তর আফ্রিকা এবং মিশরে ফাতিমীয়দের শাসনকার্যে সমর বিভাগ ছিল খুবই তৎপর। সিরিয়া প্যালেস্টাইন এবং ইয়েমেনেও তাদের প্রভাব ছিল।

www.waytojannah.com

বিচার : ফাতিমীয় দায়ী বা প্রচারকদলই আইন ও বিচারবিষয়ক কার্যাদি দেখাশুনা করার দায়িত্ব পালন করতেন। অতঃপর আবু হানিফা মুহাম্মাদ বিন নু'মান (যিনি কাদিন নু'মান নামে খ্যাত) নামে একজন যোগ্য আইনজ্ঞ ও কাযীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি আইন ও বিচারের দপ্তরটি পরিচালনা করেন। প্রথম চারজন খলিফা আইন, ধর্ম এবং প্রশাসনের বিষয়গুলি কাদিন নু'মানের পরামর্শ মুতাবিক সুরাহা করতেন। মিশর বিজয়ের পর পূর্বতন মিশরীয় কাযী, যিনি মিশর বিজয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন, তাঁকে স্বপদে বহাল রাখেন। অর্থাৎ তিনি প্রধান কাযী হিসাবে নিযুক্ত হন। তবে কাদিন নু'মানের হাতেই সকল ক্ষমতা ছিল। ফাতিমীয়দের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে মালেকী মযহাবের আইন–কানুন বলবৎ ছিল। ফাতিমীয়গণ এই আইনের বিশেষ বিশেষ ইসমাইলীয় মতবাদ সংযোজন করে চালু রাখেন। যে আইনগ্রন্থ তখন বলবৎ ছিল তা কাদিন নু'মানের দাইম আল ইসলাম নামে পরিচিত। কাদিন নু'মান একজন ঐতিহাসিকও বটে। ফাতিমীয় শাসন থেকে শুরু করে প্রথম তিনজন খলিফাকে নিয়ে তিনি "ইফতিতাহ–আদ–দাওয়া" নামক ইতিহাস রচনা করেন। তবে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হলো ধর্মীয় আইনের ক্ষেত্রে বক্তৃতা রচনা এবং গ্রন্থ প্রণয়ন। "মাজালিস নামে ৮০০ বক্তৃতামালা ৮ খণ্ডে গ্রন্থাকারে সংকলিত। এটাই ফাতিমীয় আন্দোলন, রাষ্ট্র গঠন, মতবাদ, সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা সর্ব কিছুর বিস্তারিত বিবরণসমৃদ্ধ। এই যশস্বী কাযীর মৃত্যু হয় ৩৬৩ হিজরীতে। তাঁর মৃত্যুবর্ষেই আল মুইজ মিশরে আগমন করেন। তাঁরই পুত্র আলী বিন মুহাম্মাদ বিন নু'মান তাঁর উত্তরসূরী হন। কাযী ব্যতীত মুহতাসিবের পদও ফাতিমীয় আমলে ছিল। পুলিশ ও বিচার বিভাগের সমন্বয় সাধন, জনগণের নৈতিক চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ ও পবিত্রতা এবং শালীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান, বাজারের ওজন ও পরিমাপের যথার্থতা পরীক্ষণ নিরীক্ষণ, এবং শহরের ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করতেন মুহতাসিব। এ ছাড়াও সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্রবণ এবং বিচার সম্পাদনের জন্য একটি আদালত ছিল। তার নাম Court of the Mazalim মাজালিম আদালত। অনিয়ম, অবিচার নিরসনের জন্য খলিফা স্বয়ং এই আদালতের বিচারকার্য করতেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা : প্রখ্যাত অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ইয়াকুব বিন কিল্লিসের পরামর্শে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংস্কার সাধিত হয়। ইতিপূর্বে তিনি একজন ইহুদি ছিলেন এবং মিশরের প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে উত্তর আফ্রিকায় পলায়ন করে আল মুইজের দরবারে সাদরে গৃহীত হন এবং গোটা উত্তর আফ্রিকার অর্থব্যবস্থা তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়। আল মুইজ মিশরে এলে মিশরের অর্থনৈতিক প্রশাসক আলী বিন ইয়াহয়াকে তাঁর পদে বহাল রাখেন তবে পরামর্শ এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ইয়াকুব বিন কিল্লিসের হাতে থাকে।

গোটা দেশের রাজস্ব আয় নির্ধারণ, উৎপন্ন শস্যের উপর কর ধার্য, বাণিজ্য পণ্য আমদানী রপ্তানী এবং ক্রয়–বিক্রয় মূল্যের কর নির্ধারণ, সেনাবাহিনীর ব্যয়, ধর্মীয়

www.waytojannah.com

প্রতিষ্ঠানের ব্যয়, রাষ্ট্রের সরকারী কর্মচারীর বেতন ভাতা প্রভৃতির ব্যয় ইত্যাদি আয়-ব্যয়ের একটা সুষ্ঠু নিয়ম পদ্ধতি ইয়াকুব বিন কিল্লিস অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তখনও আব্বাসী মুদ্রা সরকারী বৈধ মুদ্রা হিসাবে চলছিল, কিন্তু ইয়াকুব বিন কিল্লিস এটার পরিবর্তন করে নতুন ফাতিমীয় মুদ্রা প্রবর্তন করেন। এমন একজন সুদক্ষ অর্থনীতিবিদ পেয়ে ফাতিমীয় খলিফা সুষ্ঠুভাবে তাঁর শাসন ক্ষমতা চালাতে সক্ষম হন। রাজ্যের সেনাবাহিনীর ব্যয় যেমন প্রচুর তেমনি ছিল নির্মাণকার্য এবং রাজকীয় ব্যয়ের বহর। জনসাধারণের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রকার জনহিতকর কার্যও হোত, যেমন—সেতু, সড়ক, সরাইখানা এবং মসজিদ, বিদ্যালয় ইত্যাদি।

উজির ঃ প্রাথমিকভাবে ফাতিমীয় শাসনে উজিরের কাজগুলি দায়ীগণই সম্পন্ন করতেন। অতঃপর সেনাপতি জাওহার যখন ফাতিমীয় প্রশাসনের সাথে যুক্ত হলেন তখন তিনিই কাতিব বা সচিবের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। আল মুইজ মিশরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করলে পূর্ববর্তী ইখশিদীয় উজির ইবনে ফুরাত, যিনি মিশর বিজয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন তাঁকেই উজির পদে বহাল রাখা হয়। ইবনে ফুরাত খুবই অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। যদিও তিনি অনেক বার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চেয়েছিলেন কিন্তু ৩৬৩ হিজরী পর্যন্ত তাঁকে ঐ পদে বহাল রাখা হয়। পরে প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ইয়াকুব ইবনে ক্লিল্লিসকে প্রধান উজিরের পদে নিয়োগ করা হয়।

সাহিব আল সুরতাহ ঃ ইখশিদীয় আমলে পুলিশ বাহিনী খুবই সুগঠিত ছিল। সামরিক বেসামরিক উভয় বিভাগে পুলিশের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব ছিল। জনগণের জানমাল হেফাজত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের নিরাপত্তা ও পরিব্রাজকদের শঙ্কাহীন চিত্তে দূর সফরে যাওয়ার জন্য পুলিশ বাহিনীর তৎপরতা ছিল প্রশংসনীয়। গুপ্ত সংবাদ সরবরাহ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বিভাগের সতর্ক দৃষ্টি থাকত। ফাতিমীয় আমলে এজন্য জনগণ যথেষ্ট নিরাপদ ছিল।

দাওয়া বিভাগ ঃ ফাতিমীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল দাওয়া বিভাগের সর্বোচ্চ সাফল্য। প্রচারকদল ফাতিমীয় মতবাদকে অত্যন্ত জনগ্রাহ্য রূপ দিয়ে প্রচারকার্যে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁরা কেবলমাত্র সুন্নীদের বিরোধিতা বা আব্বাসীয় খলিফাদের উৎখাত—এ উদ্দেশ্যে প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন না, বরং ফাতিমীয় মতকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেবার জন্য তাঁরা অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে পরিকল্পিত উপায়ে কাজ করতেন।
হিজাজের মক্কা মদীনায় শরীফ শাসকদের মন জয় করে আব্বাসীয়দের পরিবর্তে ফাতিমীয় আল মুইজের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার কাজটি দায়ীগণ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করলে এই পবিত্র নগরদ্বয়ের কর্তৃত্ব ফাতিমীয়দের নিকট চলে আসে।
The news of this victory and the tidings that his name was again recited in the prayers at Mekka and Medina lightened the last days of the caliph Moizz who died about christmas. 975 in his forty sixth year১
ইয়েমেন তো ছিল ফাতিমীয়দের প্রচার কেন্দ্র এবং প্রথম শিয়া রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ভূমি। ফলে এখান থেকে বিভিন্ন স্থানে প্রচারকদল ছড়িয়ে পড়ে। তারা পারস্য উপসাগর

১ Lane Poole-p 123

www.waytojannah.com

কূলে এবং ভারতবর্ষেও চলে আসে। ইয়েমেন থেকে দায়ী হাইসাম উত্তর ভারতে আসেন প্রচারকার্যে আল মাহদীর সময়ে। আল মুইজের সময়ে ৩৪৭ হিজরীতে মূলতানে ফাতিমীয় মতবাদ অত্যন্ত সফলতা লাভ করে। অতঃপর সিন্ধু, দেবল, মানসুরা, থাট্টা ইত্যাদি অঞ্চলেও শিয়া আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। অবশ্য পরে সুলতান মাহমুদ এ অঞ্চলগুলি সবই দখল করে শিয়া প্রভাবমুক্ত করেন।

আল মুইজের সাংস্কৃতিক বিজয় ঃ ফাতিমীয়গণ শহর বন্দর নির্মাণে বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উত্তর আফ্রিকায় তারা মাহদীয়া মুহাম্মাদীয়া ও মানসুরীয়া নগর-এর নির্মাণ করেন। মানসুরীয়াতে একটা সুরম্য সাগর-প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এ প্রাসাদের মধ্যভাগে ছিল বিরাট হ্রদ। তাছাড়া ৭৩০০০ লীগ দীর্ঘ খাল খনন করে প্রাসাদের পানি সরবরাহ এবং কৃষিক্ষেত্রে পানি সেচের ব্যবস্থা করা হয়।

মিশরে আল কাহিরা নতুন নগরী অত্যন্ত সুন্দরভাবে নির্মাণ করা হয়। এখানে আল আজহার মসজিদ, খলিফার প্রাসাদ, উজির প্রাসাদ, যুবরাজদের প্রাসাদ, সচিব, কাতিব, কায়িদ এবং ধনভাণ্ডার, অস্ত্রভাণ্ডার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ইমারত নির্মাণ করা হয়। স্থাপত্য শিল্পে মুইজের অবদান উল্লেখযোগ্য।

তিনি যেহেতু অনেকগুলি ভাষা জানতেন, তাই তাঁর দরবারে অনেক জ্ঞানী-গুণী মনীষীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। শাস্ত্রজ্ঞ আবু হানিফা মুহম্মদ বিন নুমান, জাফর বিন মনসুর আল ইয়ামান, কবি ইবনে হানি এবং খলিফা পুত্র তামিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ফাতিমীয় যুগে মিশরের প্রশাসনে শিয়া প্রভাব বেশ লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। শুক্রবার, ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা, গাদিরে খুম ঈদ, ১০ই মহররম, ১লা রজব, নীলনদের বন্যা উৎসব, বসন্তের নওরোজ প্রভৃতি আনন্দ উৎসবগুলি বেশ উৎসাহ উদ্দীপনায় পালন করা হোত।

অন্যান্য ধর্মের বিদ্বান জ্ঞানী এবং সাধারণ মানুষের প্রতি আল মুইজ খুবই উদার এবং সদয় ছিলেন। তাঁর প্রধান চিকিৎসক মুসা বিন গাজাল ইহুদি, আর বিজ্ঞানী সাদিক বিন বীতরিক খ্রীষ্টান ছিলেন।

যা হোক, দীর্ঘ বাইশ বছর সাফল্যের সাথে আল মুইজ রাজত্ব করে ফাতিমীয় শাসনকে এক নবযুগের উন্নত সোপানে উন্নীত করেন।

৩৬৫ হি—৩৮৬ হিঃ
৯৭৫—৯৯৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল ইমাম নিজার আবু মানসুর আল আজিজ বিল্লাহ

আল মুইজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নিজার 'আল ইমাম নিজার আবু মানসুর আল আজিজ বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে ফাতিমীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন ৩৬৫ হিজরী মুতাবিক ৯৭৫ সালে আল কাহিরায়। সাধারণতঃ আল আজিজ নামেই তিনি পরিচিত। তিনি ৩৪৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর ফলে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। ২৪ বছর বয়সে যৌবনের পূর্ণ উদ্যম ও প্রতিভার বিকাশ নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

He is described as generous, brave, wise and humane, prone to forgiveness even with the power of punishing.১

সাহসিকতা, উদারতা, পাণ্ডিত্য, মহানুভবতা, ক্ষমা ইত্যাদি মানবীয় গুণরাজিতে নতুন খলিফা বিভূষিত হয়ে ফাতিমীয় সিংহাসনের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

Big, Brave and comely in person-though with reddish hair and blue eyes, always feared by Arabs—a bold hunter and a fearless general, he was of a humane and conciliatory disposition both to take offence and avers from bloodshed.২

লেনপুল সাহেব খলিফা আল আজিজের গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন যে, বিশাল হৃদয়, সাহসী, কমনীয়, লোহিত কেশধারী নীল চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আরবদের ভীতির সঞ্চারক—দক্ষ শিকারী, অকুতভয় সেনাপতি, সমঝোতায় বিশ্বাসী, শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা থাকলেও ক্ষমাকারী এবং রক্তপাত এড়িয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠাকামী আল আজিজ। এ সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী হয়ে খলিফা আল মাগরিব থেকে হিজাজ আর ফুরাত কূল পর্যন্ত বিশাল রাজ্য—সীমানা নিয়ে কেমনভাবে আব্বাসীয় শক্তিকে ম্রিয়মাণ করে ফাতিমীয় পতাকাকে গৌরবের সাথে উড়িয়ে বাইশ বছর ধরে শাসন করেন তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা হবে।

আল আজিজ সিংহাসনে আরোহণের পর যখন তিনি পুরাতন ফুসতাত জামে মসজিদে খুতবা দিতে ওঠেন তখন তাঁর সামনে একটি লিখিত কাগজখণ্ড দেখতে পান। সে কাগজে লেখা ছিল—"এই মসজিদের মিম্বর থেকে আপনার বংশ তালিকা সম্বন্ধে কিছু সন্দেহযুক্ত তথ্য আমরা শুনেছি। এর সত্যতা সম্পর্কে আমরা শুনতে চাই আর আপনি যথার্থই বলুন আপনার উর্ধতন পঞ্চম পুরুষের স্তরটি। আপনি যদি এর সঠিকতা প্রমাণের বাসনা রাখেন তবে পূর্ব পুরুষের বংশ তালিকা পেশ করুন। এটা এমন বিশ্বস্ত ও যথার্থ

১· Amer Ali-P 601
২· Lame Poole -119

www.waytojannah.com

হবে যেমন বর্তমান আব্বাসীয় খলিফা আত–তাঈ–এর বংশ তালিকা অবিচ্ছিন্নভাবে সত্য। যদি না পারেন তবে পূর্বপুরুষের তালিকা আঁধারে নিক্ষেপ করুন আর আমাদের বিরাট জনমানব গোষ্ঠীর বংশে প্রবেশ করুন।"[১]

এ ঘটনাই প্রমাণ করে যে, মিশরবাসী শিয়াদের প্রতি অনুরক্ত ছিল না এবং শিয়া মতবাদও ঢালাওভাবে গ্রহণ করেনি। তবে খলিফা আল আজিজ শিয়া মতবাদ প্রচার ও প্রসারে খুব বেশী উগ্রবাদী ছিলেন না। উদার তো ছিলেন বটে, উপরন্তু তাঁর শাসনের লক্ষ্য ছিল নিখাদ রাজনৈতিক। সেখানে ধর্মীয় ব্যাপারটা গৌণ হিসাবেই বিবেচিত হোত। কিন্তু তাঁর একজন স্ত্রী ছিলেন খৃষ্টান এবং তার দু' ভাই তাঁর দরবারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। খৃষ্টান মিশরীয় কিবতীদের প্রতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা এমন ছিল যে, জনশূন্য পরিত্যক্ত বা জরাজীর্ণ গীর্জাগুলিও সংস্কারের ফলে সেখানে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

আল আজিজ তাঁর পূর্বসূরীদের অনেক পিছনে ফেলে সম্পদ, জৌলুস আর জাঁকজমকের প্রতি অনুরাগ এত বৃদ্ধি করেন যে, প্রাচীন পারস্যের পাহলভী সম্রাটদের আড়ম্বরপূর্ণ বেশভূষা নতুন আঙ্গিকে শতাব্দী পর যেন আবার ফিরে আসে। সোনার সুতার তৈরি পাগড়ী, স্বর্ণখচিত সুদৃশ্য তলোয়ার আর মূল্যবান চমৎকার পরিচ্ছদ যেন খলিফাকে অপরূপ সাজে অলঙ্কৃত করল, দরবারী ওমারাহদের শান শওকতপূর্ণ বেশভূষার মাঝে। একদা পারস্যের মূল্যবান একখানা রেশমী পর্দার জন্য খরচ করেন ১২০০০ পাউন্ড সমমানের স্বর্ণমুদ্রা। এটা তাঁর অপরূপ রুচি ও বিলাসিতার উদাহরণ।

সিরিয়া ঃ আল মুইজ তাঁর শেষ জীবনে সিরিয়ার সমস্যাটি সুরাহা করে যেতে পারেননি। কিন্তু খলিফার মৃত্যু শয্যায় অভিজ্ঞ উজির ইবনে কিল্লিস কিছু সঠিক কথা বলেছিলেন সিরিয়ার ব্যাপারে। এক. গ্রীকদের সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখতে হবে। দুই. আলেপেপার হামদানীয়রা যদি জুমুআর খুতবায় ও মুদ্রায় খলিফার নাম উল্লেখ করে তবে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু বরাবরই মিশরের উচ্চাভিলাষী শাসকেরা সিরিয়া দখলের বাসনা চেপে রাখতে পারেননি। ফলে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে যুগে যুগে। বিজ্ঞ উজিরের উপদেশ ছিল আনুগত্য প্রকাশে সন্তুষ্ট থাকার চেয়ে আর বেশী কিছু কামনা না করা।

হাফতকীন আবার সিরিয়ায় উপস্থিত হয়ে দামেস্ক থেকে ফাতিমীয় শাসককে বিতাড়িত করলেন। হাফতকীনের সাথে যোগ দিল কারমাতীয়রা, ফলে হাফতকীন কেবল সিরিয়া নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলেন না। খোদ মিশরের দরজায় হানা দেবার পরিকল্পনা নিলেন। ফাতিমীয়দের অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্নে খলিফা আল আজিজ কালবিলম্ব না করে সেনাপতি জাওহারকে হাফতকীনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন বিশাল এক সুসজ্জিত সেনাদল দিয়ে। কারমাতীয়রা রামলা থেকে যখন শুনল জাওহারের বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে আসছে তখন আতঙ্কিত হয়ে তারা শহর ছেড়ে পালালো। কেউ কেউ পুরানা আস্তানা ছেড়ে বাহরাইনে ঠাই নিল আর অন্যেরা যে যেখানে পারল আশ্রয় নিল। এ সংবাদে হাফতকীন খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর তুর্কী বাহিনীসহ

১ DE Lacy O' Leary P 116

www.waytojannah.com

তিবিরিয়াসে ঘাঁটি করলেন আর বিক্ষিপ্ত কারমাতীয়রাও কিছু কিছু এসে তাঁর সাথে যোগ দিল। তারপর দামেস্ক গিয়ে জাওহারের বাহিনীর অপেক্ষায় রইলেন। নগরের বাইরে জাওহার বাহিনী তাঁবু ফেললেন এবং নগরী জয়ের কৌশল তৈরী করলেন। ৩৬৬ হিজরীর দিকে হাফতকীন অবস্থা সুবিধাজনক নয় ভেবে যখন নগর ত্যাগ করার চিন্তা করছেন, এমন সময় হাসান বিন আহমদ নামে কারমাতীয় নেতা তাঁর সাহায্যার্থে অগ্রসর হলেন। এ দিকে সেনাপতি জাওহারের রসদও শেষ প্রায়। তখন তিনি হাফতকীনের সাথে একটা সমঝোতার প্রস্তাব দেন। এটা হাফতকীনের জন্য অত্যন্ত খুশীর সংবাদ ছিল। সন্ধি হোল। জাওহার তিবিরিয়াসে উপনীত হলেন। এ সংবাদে কারমাতীয়রা তিবিরিয়াস অভিমুখে যাত্রা করলে জাওহার রামলায় পৌছান। রামলায় কারমাতীয়দের সাথে যুদ্ধ হয় সেনাপতি জাওহারের। এ সময় হাসান বিন আহমদের মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর কারমাতীয়রা অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এ সময় হাফতকীন সুযোগ বুঝে সেনাপতি জাওহারের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। জাওহার পরাজিত হয়ে আসকালনে পালিয়ে গেলে হাফতকীনের হাতে এক বিস্তর গনীমাত এসে পড়ে। উৎসাহিত হয়ে হাফতকীন আসকালন অবরোধে অগ্রসর হন। এ সংবাদে খলিফা আল আজিজ তাঁর সেনাপতির সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সৈন্য পৌছাতে বিলম্ব হওয়ায় সেনাপতি জাওহার হাফতকীনের সাথে এক শান্তিচুক্তি করেন এবং মিশরের দিকে প্রত্যাবর্তনে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে আল আজিজ সাহায্যকারী সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলে হাফতকীনের সাথে তাঁর এক তুমুল সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে হাফতকীন পরাজিত হয়ে পলায়ন কালে ধৃত হয়ে আল আজিজের নিকট হাজির করানো হয়। তাঁকে নানাভাবে নাজেহাল এবং দৈহিক নির্যাতন করে বন্দী অবস্থায় মিশরে প্রেরণ করা হয়। এ যুদ্ধে হাফতকীনের বহু সৈন্য প্রাণ হারায়।

মিশরে উপস্থিত হলে খলিফা হাফতকীনের সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করেন। তাঁকে মূল্যবান পোশাক, উপহার এবং সুন্দর বাসভবনও প্রদান করা হয়। খলিফা হাফতকীনকে তাঁর উদারতা, উপহার এবং মহানুভবতায় মুগ্ধ করেন। ৩৭২ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মিশরের অত্যন্ত সম্মানিত রাজঅনুগ্রহপুষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত ছিলেন। তাঁর সাথে আনীত সমস্ত তুর্কী বন্দীদেরকে নিয়ে একটি তুর্কী বাহিনী গঠন করেন এবং এর নেতৃত্ব হাফকীনের উপর ন্যস্ত করেন। এই তুর্কী বাহিনীই বার্বার বাহিনীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য সময় ও সুযোগ মত খলিফার কাজে আসে। অনেকে মনে করেন হাফতকীনের মৃত্যুর পশ্চাতে ইবনে কিল্লিসের হাত ছিল। তবে সিরিয়া যদিও মিশর শাসনাধীনে এল, তথাপিও নিরঙ্কুশ আধিপত্য সেখানে প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি।

খলিফা আল আজিজের শাসন ব্যবস্থা ঃ ইয়াকুব বিন কিল্লিস অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রশাসন চালান। কিন্তু হাফতকীনের হত্যার ব্যাপারে জড়িত থাকায় তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ইত্যবসরে হারেমে খৃষ্টান প্রভাব খুবই বৃদ্ধি পায় এবং

www.waytojannah.com

ইবনে নেসতুরিয়াস শাসন ক্ষমতায় বেশ প্রভাব বিস্তার করেন। তবে চল্লিশ দিন পর ইবনে কিল্লিসকে কারামুক্ত করে উজিরপদে পুনর্বহাল করা হয়। তিনি ৩৮০ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত স্বপদে বহাল ছিলেন পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে। তবে আল আজিজের প্রশাসনের উচ্চপদে সর্বদা ইহুদি খৃষ্টানরাই বহাল ছিল। খৃষ্টান ঈসা বিন নেসতুরিয়াস এবং ইহুদি ঈসা বিন মানিসমা প্রবল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাদের শাসন মিশরীয় মুসলমানেরা যেমন মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারতেন না। তেমনি তারা মুসলমানদের মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা করতেন। ৯৯৬ সালে যখন গ্রীকদের বিরুদ্ধে খলিফা একটা ব্যাপক অভিযানের জন্য ৬০০ জাহাজ প্রস্তুত করছিলেন সেই সময় একটি মারাত্মক দাঙ্গা শুরু হয় যার ফলে খৃষ্টানদের কারসাজিতে ১১টি রণতরী ভস্মীভূত হয়। বহু নাবিক এবং সৈন্য মারা যায়। বহু সংখ্যালঘু বসতি জনশূন্য হয়ে পড়ে। খলিফা অত্যন্ত কঠোরতায় এই দাঙ্গা প্রতিরোধ করেন। তবে ঈসা বিন নেসতুরিয়াস খুবই সাফল্যের সাথে তিন মাসের মধ্যে ছয়টি নতুন রনণতরী নৌবহরে সংযোগ করতে সক্ষম হন।

খলিফা যেমন সম্পদ ও জাঁকজমক পছন্দ করতেন তেমনি মন্ত্রী ও উজিরবর্গও। ইবনে কিল্লিস ১০০০০০ দিনার বেতন পেতেন। ৯৯১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁর রাজকীয় সম্পদের বহরে আছে বিস্তর ভু-সম্পত্তি, প্রাসাদ, বিপনি বিতান, ক্রীত দাস-দাসী, অশ্ব, আসবাব পত্র, উপহার সামগ্রী রত্ন অলংকার। সর্বসাকুল্যে সম্পদের মূল্য চার মিলিয়ন দিনার। এ ছাড়াও তাঁর কন্যার মোহর মূল্য ছিল দুই লক্ষ দিনার। চাকর চাকরানী ব্যতীত ৮০০ মহিলা তাঁর হেরেমে ছিল। তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর সংখ্যা শ্বেতকায় কৃষ্ণকায় মিলে ৪০০০ ছিল। তাঁর প্রাসাদ সুরক্ষিত দুর্গসম ছিল। তাঁর শব মিছিল ছিল অত্যন্ত জাঁকজমক এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ। স্বয়ং খলিফা শব মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। শবাধারে কর্পূর, সুগন্ধি, গোলাপ পানি আর উপঢৌকনের দ্রব্যাদি দিয়ে জমকালো করা হয়। একটি সুরম্য সমাধি ভবনে মৃতদেহ রাখা হয়। খলিফা সাশ্রু নয়নে তার জানাজায় প্রার্থনা করেন। তিনদিন পর্যন্ত তিনি দর্শনার্থী বা আপ্যায়ন টেবিলে কাউকে সাক্ষাৎ দেননি। ১৮ দিন সরকারী কাজ বন্ধ ছিল। একমাসব্যাপী রাজকীয় খরচে দিবারাত তাঁর সমাধিতে প্রশংসাগাঁথা আবৃত্তি ও কুরআন তেলাওয়াত হয়। কবর জিয়ারতকারী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য ক্রীতদাসীরা রূপার কাপ আর চামচ নিয়ে তৈরী থাকত মদ ও মিষ্টান্ন পরিবেশনের জন্য। খলিফা মৃত উজিরের সকল ক্রীতদাসকে মুক্তি দেন। দেনা পরিশোধ করেন। বিশাল বাসভবনের খরচ নির্বাহ করেন। এমনি ভক্তি শ্রদ্ধা আর ভালবাসা উজাড় করে দেন ইবনে কিল্লিসের জন্য। অথচ এর এক বছর পর মিশরবিজয়ী ফাতিমীয় ক্ষমতার দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা সেনাপতি জাওহারের মৃত্যু হলে মাত্র ৫০০০ দিনার তাঁর পরিবার খলিফার নিকট হতে প্রাপ্ত হন।

খলিফা সর্বদাই অতি আশ্চর্য জীবজন্তু, বিরল মণিমুক্তা ও হীরকখন্ড সংগ্রহ করতে উৎসাহী ছিলেন। নানা জাতের পশুপাখী তিনি জমা করতেন বিস্তর অর্থব্যয়ে। জনসাধারণের কৌতুহলী ভিড় যেন তার পছন্দ হোত এমন ভাবেই। তবে রাজকোষের হিসাব অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। ঘুষ বা উপহার কোনটাই তিনি তাঁর লিখিত অনুমোদন ছাড়া দিতেন না।

www.waytojannah.com

খলিফার স্থাপত্যকীর্তি অবিস্মরণীয়। সুদক্ষ কারিগর, প্রকৌশলী ও পরিকল্পনাবিদ দ্বারা তিনি অনেকগুলি সুরম্য প্রাসাদ, ইমারাত ও মসজিদ নির্মাণ করেন। সোনালী প্রাসাদ, মুক্তাভবন, কারাফা সমাধিক্ষেত্রে মায়ের নামে মসজিদ, ৯৯১ সালে নির্মিত বিরাট মসজিদ যা আল হাকিম মসজিদ নামে পরিচিত, এগুলি সবই তার কীর্তি। অনেকগুলি খাল ও সেতু এবং জাহাজ নির্মাণ কারাখানা তিনি স্থাপন করেন।

খলিফা কতকগুলি নতুন কাজ করেন, যা তার পূর্বসূরীদের আমলে ছিল না। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল রামাযান মাসে জুমুআর দিবসে রাষ্ট্রীয় শোভাযাত্রা, জনগণের মাঝে সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে সালাত পরিচালনা, চাকুরে এবং আশ্রিতদের নির্ধারিত বেতন প্রদান এবং তুর্কী দেহরক্ষী বাহিনী গঠন। তিনি কবিতা পছন্দ করতেন এবং আবৃত্তিও করতেন। ভবিষ্যদ্বক্তার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। কারণ ফাতিমীয়রা আজগুবি বাণীতে জনগণকে মুগ্ধ করার কাজটি বরাবরই করতেন। অন্যকে সমালোচনা ও উপহাস করাও তাদের কাজ ছিল। খলিফা একদা স্পেনের উমাইয়া খলিফাকে উপহাস করে একটা পত্র দেন। জবাবে উমাইয়া খলিফা লেখেন–

You ridicule us because you have heard of us: if we had ever heard of you, we should reply–[১]

কাযী ঃ আল আজিজের আমলে ফাতিমীদের ইতিহাস প্রণেতা, ধর্মীয়-কানুন ও বিচার ব্যবস্থার সংকলক কাদিন নু'মানের পরিবার দাওয়া ও বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন। ৩৬৩ সালে কাদিন নু'মানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলী বিন নু'মান কাযীর পদ অলঙ্কৃত করেন। আল আজিজের সময়ে মূলতঃ তিনিই ছিলেন বিচার বিভাগের শক্তিমান মানুষ। ৩৭৪ হিজরীতে তার মৃত্যুর পর তাঁর ভাই মুহাম্মদ বিন নু'মান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। মুহাম্মাদ বিন নু'মান ইয়েমেনে প্রচারকার্য জোরদার করার জন্য আব্দুল্লাহ বিন বিশরকে প্রেরণ করেন। ভারতের মুলতানেও জালাম বিন শাইবানের দ্বারা ইসমাইলীয় মতবাদ জোরদার হয়।

আলী এবং মুহাম্মাদ ভ্রাতৃদ্বয় আইনের ও দাওয়ার উপর অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়নকরেন।

খলিফার মৃত্যু ঃ ৩৬৮ হিজরীতে খলিফা সিরিয়ায় গমন করেন। সেখানে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২৩শে রামযানে তাঁর রোগযন্ত্রণা প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি তখন কোষাধ্যক্ষ বারজোয়ানের ভবনে অবস্থান করছিলেন। তাঁর অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে গেলে তিনি কাযী মুহাম্মাদ বিন নু'মান ও সেনাপতি আবু মুহাম্মাদ বিন হাসান ইবনে আম্মারকে উপস্থিত হবার জন্য নির্দেশ দেন এবং তাঁর ১১শ বর্ষ বয়স্ক পুত্রের (আল হাকিম) প্রতি দৃষ্টিদানের অনুরোধ রাখেন। তাঁর পুত্র আল হাকিমকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তাঁর প্রতি উপস্থিত সকলে আনুগত্য প্রদর্শনের পর রাজকীয় দ্রব্যাদি তাঁর নিকট হস্তান্তর করেন। ২১ বছর শাসনের পর ৪২ বছর বয়স্ক আল আজিজ ইনতিকাল করেন। বারজোয়ান তাঁর পুত্রের অভিভাবক এবং কাযী

১ Lane Poole P-123

মুহাম্মাদ বিন নু'মান ও সেনাপতি হাসান বিন আম্মার তাঁর উপদেষ্টারূপে মনোনীত হন।

কৃতিত্ব : Never the less Aziz was the wisest and most beneficient of all the Fatimid Caliphs of Egypt. ১

খলিফা আল আজিজ খুবই পরিশ্রমী সতর্ক এবং রাজ্য শাসন ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন। আল মাগরিবের আটলান্টিক উপকূল হতে শুরু করে আলেপে পা পর্যন্ত হেজাজসহ সমুদয় অঞ্চলে তাঁর নামে খুতবা পঠিত হোত। সম্ভবতঃ এই সময়টিই ছিল ফাতিমীদের সোনালী যুগ। শিক্ষা, স্থাপত্য, সঙ্গীত, কাব্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ফাতিমীয়দের অবদান যেমন প্রাচ্যকে অনেকাংশে আব্বাসীয় ক্ষয়িষ্ণু কীর্তির ক্ষতিপূরণস্বরূপ ছিল, তেমনি পাশ্চাত্যে উমাইয়া কর্দোভা ইউরোপের বাতিঘররূপে দিবাকরের মত প্রোজ্জ্বল ছিল।

তিনি প্রশাসনকে সুশৃঙ্খল, নিয়মিত এবং দক্ষ করে তোলেন। সেনাবাহিনীকে স্থলে ও নৌপথে শক্তিশালী করেন নতুন ইউনিট, দুর্গ এবং জাহাজ ও পোতাশ্রয় নির্মাণে। কৃষি শিল্প বাণিজ্যে তাঁর প্রভূত উন্নয়নে জনগণের কল্যাণ সাধিত হয়। বহুমুখী প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও হেরেমের প্রভাবে তিনি খুবই প্রভাবিত হয়ে পড়েন। ফলে মিশরবাসীর অকুণ্ঠ ভালবাসার ঘাটতি দেখা দেয়। ইহুদি ও খৃষ্টানদের সমূহ হস্তক্ষেপ অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্ম দেয়, যদিও কিছু দক্ষ কর্মচারী তাঁকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেন। তবুও তিনি দয়ালু, মহানুভব এবং শিল্প সাহিত্য এবং সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সকলের ভক্তিভাজন।

In person Al Aziz was tall, broad shouldered, with reddish hair and eyes large and of a dark blue colour..........২

এমন এক বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী খলিফা ফাতিমীয় শাসনকে অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক কল্যাণের উপর রেখে ইনতিকাল করেন তাঁর নাবালক পুত্রের উপর বিশাল সাম্রাজ্যের বোঝা অর্পণ করে।

১. Ibid do
২. O' Leary 115

www.waytojannah.com

৩৮৬ হি–৪১১ হিঃ
৯৯৬–১০২১ খ্রীঃ

সপ্তম অধ্যায়

আল মনসুর আবু আলী হাকিম বি আমরিল্লাহু

৩৮৬ হিজরীর ২৩শে রামাজান আল আজিজের মৃত্যু হলে তাঁর ১১ বছর বয়স্ক পুত্র আল মনসুর আবু আলী আল হাকিম বি আমরিল্লাহ ফাতেমীয় খলিফা হিসেবে সকলের আনুগত্য লাভ করেন। তিনি ৩৭৫ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন খ্রীষ্টান মাতার গর্ভে। খলিফা আল আজিজের একমাত্র পুত্র নাবালক অবস্থায় সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন এবং শিয়া ইমামতের ইমামরূপেও স্বীকৃত হন। তাঁর অভিভাবক ও গৃহশিক্ষক ছিলেন কোষাধ্যক্ষ বারজোয়ান। সেনাপতি আমীর হাসান বিন আম্মার ও কাযী মুহম্মদ বিন নু'মান সকলেই রাষ্ট্রের পরিচালক মণ্ডলী হয়ে বালক খলিফার খিলাফতকে পরিচালনার কাজে সাহায্য করেন।

বিলবেঈ হতে খলিফা আজিজের মৃতদেহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কায়রোতে আনা হয়। প্রাসাদেরই পার্শ্বে আল মুইজের সমাধিক্ষেত্রে আল আজিজেরও শেষ শয্যা শানশওকতের সাথে রচিত হয়।

এবার আনুষ্ঠানিকভাবে নাবালক খলিফার অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তা প্রাসাদে স্বর্ণখচিত সিংহাসনে উপবেশনের জন্য খলিফাকে রাজকীয় ভূষণে সজ্জিত করা হয়। মস্তকে স্বর্ণ শিরোপা, কটিদেশে রত্নখচিত চকচকে তলোয়ার, মুঠিতে বর্শা ও সালঙ্কার ভূষিত পরিচ্ছদে দেহাবৃত করে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে অগ্রপশ্চাৎ দক্ষিণ বামে সজ্জিত সেনা ও উচ্চপদস্থ ওমারাহসহ খলিফা সরকারী প্রাসাদ অলিন্দে অবতরণ করলে সকলেই আভূমি নত হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়ে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করেন। পদমর্যাদা অনুসারে কর্মকর্তাবৃন্দও আসন গ্রহণ করেন ভূমি চুম্বন করে। অতঃপর খলিফা আল আজিজ নিযুক্ত অভিভাবক কোষাধ্যক্ষ বারজোয়ান শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করে খলিফাকে আল হাকিম বি আমরিল্লাহ উপাধি দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ফাতেমীয় ৬ষ্ঠ খলিফারূপে গ্রহণ করেন। বারজোয়ান অভিভাবক এবং খলিফার প্রতিনিধিরূপে বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তদারকীর কাজ চালানোরই কথা ছিল। কিন্তু কার্যতঃ তা হয়নি। কারণ উচ্চাভিলাষীদের প্রতিযোগিতা প্রবল হয়ে ওঠে। উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত কাতামা গোত্রের বার্বার সেনাপতি রাষ্ট্রের প্রধান উজিরের পদটি দখল করে নেন। ঈসা বিন নেসতুরিয়াসকে অপসারণ করে সচিবের পদটিকেও নিজের দখলে নিয়ে 'আমিন–আদদৌল্লাহ' উপাধি নিয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন।

উত্তর আফ্রিকার কাতামা বার্বার গোত্র উত্তর আফ্রিকা ও মিশর বিজয়ে ফাতেমীয়দের

www.waytojannah.com

জন্য যে অবদান রাখে তার সুফল তারা পুরাপুরি গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। তারা অলীক এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ফাতেমীয়রা, এটা আর বিশ্বাস করতে চাইল না। কারণ ফাতেমীয়রা তেমন কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতার নিদর্শন দেখাতে পারেনি। ফলে বার্বারগণ এবার সরাসরি ক্ষমতা গ্রহণ করতে তৎপর হয়ে উঠল। তাদের অর্জিত ফসল যেমন স্পেন আরবরা ভোগ করেছে, অনুরূপভাবে এখানেও আরবদের আর ভোগ করতে দেয়া যায় না। ফাতেমীয় রাষ্ট্রটি এখন লৌকিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য চেষ্টায় নিয়োজিত হোল তারা। ধর্মীয় আবেদন রাষ্ট্র হতে বিযুক্তির জন্য ইবনে আম্মার যেমন তৎপর তেমনি নাবালক খলিফাকে অকেজো করে বার্বার সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও জোরদার করলেন। ইবনে আম্মারের এসব কার্যকলাপ বারজোয়ানকে খুবই বিব্রত করে। কার্যতঃ তাঁকে কেবল নাবালকের গৃহশিক্ষক ব্যতীত আর কোন দায়িত্বেই রাখেননি। ইবনে আম্মার সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেও বারজোয়ান নীরব ছিলেন না। তিনি ইবনে আম্মারের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে খিলাফতের ক্ষমতা তাঁর নিকট হতে গ্রহণের উপায় অন্বেষণ করতে লাগলেন।

এই সময় সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন মানজুতাকিন। বারজোয়ান তাঁর সাহায্য কামনা করলেন। হাকিমের প্রাথমিক অবস্থায় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হোল। মানজুতাকিন একজন তুর্কী ছিলেন। তিনি দেখলেন মিশরে পূর্ববর্তী খলিফা আল আজিজের সময়ে হাফতকীনের নেতৃত্বে তুর্কী বাহিনী গঠিত হয়েছে। এখন মিশর মূলতঃ বার্বারদের নিয়ন্ত্রণে। অতএব তুর্কী প্রধান্য কায়েম করার লক্ষ্যে বারজোয়ানের আবেদনের প্রেক্ষিতে মিশরে সাহায্য প্রেরণের প্রস্তুতি নিলেন। এ সংবাদটি ইবনে আম্মারের নিকট বিদ্রোহ মনে হোল এবং সিরিয়ার বিরুদ্ধে সুলাইমান বিন জাফর বিন ফাল্লাহ নামক এক বার্বার সেনাপতিকে প্রেরণ করলেন। ইবনে আম্মার ও বারজোয়ানের মধ্যে ক্ষমতা দ্বন্দ্ব এখন সংঘর্ষে রূপ নিল।

মানজুতাকিনের সেনাদলের সাথে আসকালোন বা রামলায় যুদ্ধ হল। ইবনে আম্মারের সেনাদল বিজয়ী হয়ে মানজুতাকিনকে বন্দী করে মিশরে প্রেরন করলে ইবনে আম্মার তাঁকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। কারণ ইবনে আম্মার বার্বার ও তুর্কী উভয় জাতির সাহায্যে ফাতেমীয় বিরোধী শাসন কায়েম করতে চাইলেন। কেননা তুর্কীদের সমর্থন ব্যতীত কেবল বার্বার শক্তি মিশরে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়।

সুলাইমান তাঁর বিজয়ী বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার শাসনকর্তা হলেন। তিনি তাঁর ভাই আলীকে দামেস্কের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তিবিরিয়ানের দিকে অগ্রসর হন। এই সময়ে ইবনে আম্মারের বার্বার বাহিনী প্রায় সবটিই সিরিয়ায়। মিশরে বারজোয়ান এই সময়টি তাঁর ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সুবর্ণ সুযোগ মনে করে বার্বার ও তুর্কী সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টির লক্ষ্যে গোপনে তুর্কীদেরকে প্রচুর উৎকোচ প্রদান করেন। ফলে, কায়রোর রাস্তায় রাস্তায় তুর্কী-বার্বার সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থা এমন সংকটে পৌছাল যে ইবনে আম্মার বাধ্য হলেন আত্মগোপন করতে।

বারজোয়ান পুনরায় খলিফার প্রকৃত অভিভাবক এবং প্রধান উজির ও সচিবের পদে ফিরে এসে ফাতেমীয় শক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি সিরিয়া হতে ইবনে

আম্মারের শাসনকর্তা সুলাইমানের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিরিয়ায় তাঁর লোকজনকে লিখলেন। মিশরে যখন বার্বার শক্তির পতন ঘটেছে তখন সুলাইমানের সিরিয়ায় টিকে থাকার আর কোন সুযোগ ছিল না। ফলে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় সিরিয়া হতে সুলাইমানকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। ইবনে আম্মারকে গৃহবন্দী করা হয়েছিল। কিন্তু বার্বার সৈন্যদের কায়রোতে প্রত্যাবর্তনের আশঙ্কায় তাঁকে মুক্ত করে দেয়া হয়। তবে তাঁর কৃতকর্মের বিচারের জন্য আদালতে হাজির হওয়ার সময়ে তুর্কীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে আক্রমণ করে এবং নিহত করে ছিন্ন মস্তক খলিফার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর নিকট প্রেরণ করে। ইবনে আম্মারের প্রাসাদ লুন্ঠন ও তছনছ করা হয়। এমনিভাবে ১১ মাসের উচ্চাভিলাষী ক্ষমতার প্রতাপ নিষ্ঠুরভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল।

প্রচুর ধনরত্ন আর প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বারজোয়ান অত্যন্ত বিলাসী এবং ক্ষমতাপিপাসু হয়ে ওঠেন। প্রায় ৩ বছর যাবৎ বারজোয়ান মিশর, সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং হিজাজে তাঁর প্রতিপত্তি নিরাপদ ও অক্ষুন্ন রাখেন। খলিফাকে তিনিও সক্রিয় ক্ষমতায় না রেখে নাবালকত্বের অজুহাতে অত্যন্ত কৌশলে দূরে সরিয়ে রাখতে সচেষ্ট হন। কিন্তু খলিফা আল হাকিম ধীরে ধীরে তাঁর অভিভাবকের কুট কৌশল বুঝতে পারেন। ফলে বারজোয়ানের হাত হতে নিস্কৃতি নিয়ে সরাসরি ক্ষমতা গ্রহণের অপেক্ষায় রইলেন। কাফুরের মত বারজোয়ান মিশরের শাসন ক্ষমতায়। নতুন স্বপ্নের অন্বেষায় বারজোয়ান। খলিফাকে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতার প্রদর্শনী হিসেবে রাখবার চেষ্টা তাঁর সমস্ত কর্মপ্রক্রিয়ায়। অতঃপর ফাতেমীয় খলিফা নবযৌবনের কর্মজোয়ারে অধীনতা আর তদারকী অভিভাবকত্ব ছিন্ন করে নিজহাতে ক্ষমতাগ্রহণ কল্পে অত্যন্ত গোপনে বারজোয়ানকে হত্যা করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি দেখলেন, মিশরে আবারও দাঙ্গা শুরু হয়েছে। জননিরাপত্তা দারুণভাবে বিঘ্নিত। বারজোয়ানকে হত্যার ফলে নগরে গৃহযুদ্ধের দুয়ার খুলে যায়। কিন্তু খলিফা দৃঢ় হস্তে এগুলি দমন করেন।

বারজোয়ানের পর খলিফা হোসাইন ইবনে জাওহারকে প্রধান উজির হিসেবে নিয়োগ করেন। তাঁকে কায়িদ আল কু'য়াদ 'সেনাপতিদের সেনাপতি' উপাধি প্রদান করা হয়। খৃষ্টান ফাহাদকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করা হয়। প্রথমে ফাহল বিন তামিমকে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। শান্তিশৃঙ্খলা রাজ্যে স্থাপিত হয়। খলিফা বেশ কতকগুলি নতুন নতুন আইন ও কানুন চালু করেন। কানুনগুলির মধ্যে ছিলঃ–

(১) খলিফাকে আমাদের মালিক, প্রভু ইত্যাদি খিতাবের পরিবর্তে কেবলমাত্র আমিরুল মুমিনীন সম্বোধন করতে হবে।

(২) দিনের পরিবর্তে রাতের গুরুত্ব অধিক প্রদান। মন্ত্রী বা উপদেষ্টা পরিষদের মিটিং রাতে করতে শুরু করেন।

(৩) তিনি রাতে ধর্মীয় নেতাদের সাথে মিলিত হতেন এবং নগর ভ্রমণে বের হতেন।

(৪) কৃত্রিম আলোয় রাস্তাগুলি আলোকমালায় সাজান হোত এবং দোকান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবই রাতে খোলা রাখার এবং ক্রয়–বিক্রয়ের নির্দেশ দেন।

(৫) সকল বিপনি বিতান ও গৃহগুলিতে আলোকসজ্জার প্রতিযোগিতা লেগে যেত। পুরানো ফুসতাত নগরী আর নতুন কায়রো যেন আলোর মেলায় ঝলমল করত।

www.waytojannah.com

লোকজনের নৈশভ্রমণ বিলাসিতায় পরিণত হোত। আর কিছু অবাঞ্ছিত নৈতিকতা বিরোধী কাজেরও জন্ম দিল। ফলে খলিফা মহিলাদের রাতে ঘর হতে বের না হবার কঠোর নির্দেশ দেন। এমনকি জুতা প্রস্তুতকারকদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয় যেন তারা মহিলাদের বহির্গমন জুতা তৈরী না করে।

(৬) মদ নিষিদ্ধ করা হোল। পাত্রগুলি সবই ভেঙে ফেলা হলো। মদের যে কোন ব্যবহার দন্ডযোগ্য অপরাধ ঘোষিত হোল।

(৭) শূকর, কুকুর নিধন করা হোল।

(৮) উত্তম ষাঁড় জবাই নিষিদ্ধ হোল একমাত্র কুরবানী উৎসব ব্যতীত।

(৯) জুয়া এবং এজাতীয় যাবতীয় ধর্মবিরুদ্ধ খেলাধুলা এবং অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ করা হলো।

(১০) ইহুদী খ্রীষ্টানদেরকে তাদের ধর্মীয় নিদর্শন ঘন্টা ও ক্রুশ পরা বাধ্যতামূলক করা হোল।

এমনিভাবে অনেক অনেক নতুন নিয়ম চালু করার নির্দেশ দিলেন খলিফা। এগুলি অমান্যের অপরাধ মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়। তবে রাতের কাজকর্মের আদেশ বেশ পরে রহিত করা হয়। খ্রীষ্টান ইহুদিদের উপর আরোপিত কিছু বিধি নিষেধ জারি হলেও যোগ্য অভিজ্ঞদেরকে উচ্চ সরকারী পদেও নিয়োগ করা হয়। ইবনে আব্দুন ও জুরা ইবনে নেসতুরিয়াস উজির হিসেবে যোগ্যতার সাথে কাজ করেন।

প্রথম দিকে আল হাকিম বেশ খেয়ালী ছিলেন। নানা নতুন নিয়ম কানুন প্রবর্তন ও এগুলি পালনে ব্যতিক্রম হলে–মৃত্যুদণ্ড প্রদান যেন তাঁর একটা অদ্ভুত খেয়ালী শখে পরিণত হয়। ফলে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে প্রাণ হারাতে হয়।

আবু রাকওয়ার বিদ্রোহ ঃ নতুন নতুন নিয়ম প্রবর্তনের ফলে আল হাকিমের বিরুদ্ধে বেশ গণ অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়। ঠিক এমন এক সময়ে স্পেনের উমাইয়া রাজপুত্র ওয়ালিদ বিন হিশাম উত্তর আফ্রিকায় পালিয়ে আসেন। দরবেশ সুরাতে মিশর, সিরিয়া, মক্কা, ইয়েমেন প্রভৃতি অঞ্চলে সফর করেন। অতঃপর উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমী বিরোধী বার্বার গোত্র জানাতার সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করে তিনি বারকা দখল করে নেন। এদিকে হোসাইন বিন জাওহার এবং প্রধান কাযী আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মদ বিন নুমানের গোপন সাহায্য পেয়ে মিশর আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। মিশর সীমান্তে খলিফা প্রেরিত এক সেনাদলকে তিনি পরাজিত করেন।

অতঃপর খলিফা ফজল বিন হাসানকে এক সুদক্ষ সিরীয় বাহিনীর সাহায্য পুষ্ট করে আবু রাকওয়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এবার আবু রাকওয়া বিফল হয়ে সুদানের দিকে পলায়ন করেন।

অতঃপর ৪০১ হিজরীতে তাঁকে সুদানে গ্রেফতার করে মিশরে পাঠান হয় এবং তাঁকে হত্যা করা হয়।

উজির ও কাযীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় আবু রাকওয়ার সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার দরুন। আবু রাকওয়ার বিদ্রোহ দমনের পর খলিফা বেশ সদয় ও মহানুভব হয়ে

www.waytojannah.com

ওঠেন প্রজাবৃন্দের প্রতি। মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য অনেক কড়াকড়ি আদেশ শিথিল করে মন জয় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের প্রতি তাঁর কঠোর মনোভাবের ফলে যে ক্ষত সৃষ্টি করে তা ছিল অনেক গভীরে, সহজে নিরাময়যোগ্য নয়। খলিফার আদেশে ধ্বংস হয়েছে জেরুজালেমসহ রাজ্যের বহু গীর্জা, ধর্ম–মন্দির, উপসনালয়, নিহত হয়েছে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। সম্পদ ও সম্পত্তিহারা হয়েছে অনেক বিত্তবান। ফলে তাঁর প্রতি বিরাগভাজন অনেকেই।

সুন্নী মুসলমানেরাও আদৌ খুশী ছিলেন না। তাঁর অসুস্থ মস্তিষ্ক অনেক অপকর্মের আদেশ দেয় যা ধর্মীয় দৃষ্টিতে ছিল সুন্নীদের জন্য মারাত্মক। আযানে 'হাই আ' লাল ফালাহ'–কল্যাণের বা মুক্তির জন্য এসো।' এ শব্দ উচ্চারণ রহিত করেন। অবশ্য ৩৯৩ হিজরীতে তাঁর নিষেধাজ্ঞা–'সালাতুজ জোহা ও সালাতুল কুনূত পুনরায় পড়ার নির্দেশ দেন।

আল হাকিমের সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিয়াগণ এসে কায়রোতে বসবাস করতে শুরু করে। কারণ তারা মনে করে এটাই তাদের নিরাপদ স্থান। খলিফা শিয়াদেরকে উৎসাহিত করেন এ ব্যাপারে এবং কায়রোকে শিয়া পুণ্যভূমি হিসেবে পরিগণিত করার জন্য আদেশ দেন যে হযরত জাফর আস সাদিকের মদীনার বাসগৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র এবং আলে আলীগণকে অবিলম্বে যেন কায়রোতে আনা হয়। দায়ী খাতকীন হযরত জাফর আস সাদিকের গৃহ হতে একখানা আল কুরআন, একটা শয্যা এবং আরো কিছু আসবাবপত্র ও বেশ কিছু অর্থ–সম্পদ যা শরীফ শাসকগণ জমা রাখতেন তা কায়রোতে নিয়ে আসেন। সঙ্গে আসেন আলী বংশীয়গণ ও শরীফগণ। কিন্তু আলে আলী আল হাকিমের নিকট হতে আকাঙ্ক্ষিত কিছু পাননি। যৎসামান্য অর্থ পান অথচ প্রচুর সম্পদ দায়ী খাতকীন আত্মসাৎ করেন। ফলে শরীফগণ অভিশাপ দিয়ে কায়রো থেকে মদীনা ফিরে যান।

এবার খলিফা আর একটি সাংঘাতিক অপকর্মের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি গোপনে এক দূত প্রেরণ করেন যে, প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রাঃ) এর মৃতদেহ রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর পবিত্র সমাধি ক্ষেত্রী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। মদীনা মসজিদের পাশেই এক জন আলী বংশীয় বাস করতেন। দূত তার বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এবং সেই বাড়ী হতে সুড়ঙ্গ পথ খুঁড়ে লাশ অপহরণের চেষ্টায় লিপ্ত থাকেন। খননকার্য চলা অবস্থায় অকস্মাৎ প্রবল বেগে ঝড় শুরু হয়ে যায়। মদীনাবাসী আতঙ্কিত হয়ে মদীনার মসজিদ ও পবিত্র রওযায় আশ্রয় নেয়। ঝড়ের তীব্রতা বেড়েই চলে। লোকে মহাবিপদে মৃত্যু আসন্ন জেনে হতাশ হয়ে পড়ে। খলিফা প্রেরিত দুর্বৃত্ত দূত এবং আশ্রয়দাতাও ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে তারা উভয়ে মদীনার গভর্ণরের নিকট তাদের পরিকল্পনা এবং কৃতকর্মের কথা স্বীকার করেন। গভর্নর তাদের শাস্তি প্রদান করেন এবং পরিকল্পনা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ঝড় থেমে যায় এবং জনমনে স্বস্তি ফিরে আসে। আল হাকিমের উদ্দেশ্য ছিল কায়রোর সুন্নী মুসলমানদের খুশী করার জন্য ঐ দুটি সম্মানিত লাশ কায়রোতে এনে সমাধিস্থ করা। কিন্তু ব্যাপারটি এত সহজ এবং সম্ভব ছিল না। ৪০১ হিজরীতে খলিফা আবার

www.waytojannah.com

আদেশ দেন যে আযানে আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম এটা বলা যাবে না। তবে হাই আ'লাল ফালাহ বলা চলবে। সালাতুজ জোহা আদায় করা যাবে না। রামাযানে তারাবীহ সালাতও আদায় করা যাবে না। ফুসতাতের জামে মসজিদের ইমাম এই আদেশ না মানলে তাঁকে হত্যা করা হয়। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে খামখেয়ালী ও বিকৃত মস্তিষ্কসুলভ আদেশ প্রদানে সকল শ্রেণীর মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিব্রত করে তোলেন। দরবারের উজির এবং প্রদেশের গভর্নরদের জীবনও ছিল দারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে। বহু ব্যক্তিকে তিনি হত্যা করেন। বহু ব্যক্তি পালিয়ে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করেন।

৪০৪ হিজরীতে খলিফা সুলতান মাহমুদ গজনভীকে পত্র দেন যেন তিনি খলিফা আল হাকিমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু সুন্নী মুসলিমের গৌরব ও গর্বের প্রতীক এই পত্র পেয়ে এত বেশী ক্রোধান্বিত হয়ে যান যে, তিনি দূতের সামনেই পত্রটি টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলেন। ছিন্ন পত্রের টুকরাগুলির উপর থুথু নিক্ষেপ করে তা পাঠিয়ে দেন আব্বাসীয় খলিফা আল কাদির বিল্লাহর নিকট।

এ সময় খলিফা আল কাদির বিল্লাহ শিয়া ফাতেমীয় খলিফারা যে হযরত আলী ও ফাতিমার বংশধর নয় তার জন্য প্রখ্যাত শিয়া সুন্নী বংশ–তালিকাবিদগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের একটি ফতোয়া বা নির্দেশনামা সমস্ত অঞ্চলে জারি করেন। খলিফা আল হাকিম সুন্নীদের ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য খুতবা বা দেওয়ালে অথবা সরাইখানা বা মসজিদে সুন্নী খলিফা বা ব্যক্তি অথবা সাহাবাদের বিরুদ্ধে লিখনীগুলি সব মুছে ফেলার নির্দেশ দেন।

দারাজী বা ড্রুজেস (Druzes) : লেবাননের পার্বত্য এলাকায় ইসমাইলীয় সম্প্রদায়ের একটি অংশ অদ্ভুত বিশ্বাসপুষ্ট হয়ে নিজদেরকে সুগঠিত করেন।

হাসান আল আখরাম নামক এক পারসিয়ান ফারগানা হতে এসে মিশরে আল হাকিম খলিফাকে আল্লাহর গুণাবলীতে ভূষিত করে তাঁর মধ্যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে এটা প্রচার করতে শুরু করে। ওই ব্যক্তি ছিল শিয়া মতবাদের উগ্রপন্থী। সে মুসলিম ধর্মবিশ্বাস ও আচরণের যাবতীয় পদ্ধতিকে অস্বীকার করে। একদা ৫০ জনের এক ভক্তের দল নিয়ে ফুসতাতের জামে মসজিদে উপস্থিত হয়। তথায় তখন কাযী বিচারকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। হাসান কাযীকে একটি প্রশ্নের শুরুতে উচ্চারণ করে বিসমি হাকিম আর রহমানির রাহীম। মহান খলিফা আল হাকিম দাতা ও দয়ালুর নামে আরম্ভ করছি। একথা শ্রবণে কাযীসহ উপস্থিত সকলে ভীষণ রাগান্বিত হন এবং উত্তেজিত জনতা ঐ দলের কতিপয় ব্যক্তিকে হত্যা করে কিন্তু আখরাম পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এ দলের লোকেরা খলিফাকে বিভিন্ন অবতার বা দেবতার সাথে তুলনা করে তাঁর আরাধনায় লিপ্ত থাকে। কিছু দিন পর এই হাসান আল আখরামকে এক ব্যক্তি হত্যা করে এবং হাসানের ভক্তেরাও হত্যাকারীর প্রাণসংহার করে। তবে সুন্নীরা নিহত ব্যক্তিকে অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং সুকর্মের অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করে।

www.waytojannah.com

অতঃপর পারস্যের জাওজান থেকে আগত হামযা বিন আলী বিন আহমদ হাদী এ দলের নেতৃত্ব প্রদান করে। দারাযীগণ হামজাকে তাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা মনে করে। খলিফার সাথে গোপনে তার সাক্ষাৎ হয় এবং সে দলীয় মতবাদ জনসমক্ষে প্রকাশ ও প্রচার করে। সে মসজিদে বির নামক উপসনালয়ে থাকত। সেখান থেকে মিশর ও সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে দলের প্রচারকবৃন্দকে মতবাদ প্রচারের জন্য প্রেরণ করত।
হামযার দ্বারা খলিফা খুবই প্রভাবিত হল এবং নিজকে আধ্যাত্মিকভাবে আলোকিত এবং ঐশ্বরিক শক্তিমানরূপে ভাবতে থাকেন। খলিফা সালাত সিয়াম পরিত্যাগসহ লোকজনকে হজ্জব্রত পালনেও নিষেধ করেন। কাবার গিলাফ প্রেরণ বন্ধ করে দেন। হামযা এবং শিয়াদের প্রতীক দ্বাদশ শিষ্যবর্গ দ্বারা সর্বদা খলিফা পরিবৃত থাকতেন। ৪০৮ হিজরীতে খলিফা হাকিমই যে আল্লাহর সাক্ষাৎ রূপ এটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় এবং খলিফা এতে সম্মতি দেন। খলিফা রাস্তায় বের হলে দারাযী সম্প্রদায়ভুক্তেরা মাটিতে সিজদা করে তাঁকে সম্মান করত এবং বলত তুমিই জন্ম ও মৃত্যুদাতা। ইস–লাম ধর্মের কোন আবেদন খলিফার নিকট প্রয়োজন বলে মনে হোত না। ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের সাথে মুসলমানের ধর্মের কোন প্রভেদ নেই এটাই তার বিশ্বাস। ফলে ইতিপূর্বে গোপনে মুসলিম নামধারী বহু ইহুদী খ্রীষ্টান পুনরায় প্রকাশ্যে তাদের পূর্বমতে ফিরে গেল। উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া, মিশরসহ প্রতিটি অঞ্চলে খলিফার এহেন অদ্ভুত আচারণ ও নির্দেশ দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সমগ্র রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তবে খলিফা তাঁর প্রাসাদে শক্তিশালী দেহরক্ষী বাহিনী গঠন করেন। কিন্তু দারাযী সম্প্রদায় তাকে করুণ পরিণতির দিকে পরিচালিত করে। সর্বত্র এরূপ বিশৃঙ্খলায় প্রাসাদে তাঁর বোন সাইয়েদাতুল মূলক বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন যে তাঁর পিতার রাজ্যটি এমনিভাবে শেষ হয়ে যাবে?
ভাইকে উপদেশ দিয়ে কোন ফল হোল না। তিনি গোপনে বার্বার প্রধানদের সাথে মিলিত হয়ে পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন।
১০২১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি খলিফা দারাজীদের প্রচার কেন্দ্র এবং তার বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র মুকাত্তম পর্বতে তাঁর নিজস্ব বাহনে রাতের বেলায় গমন করেন। অতঃপর তাঁকে আর জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর একাধিক ঘটনা আছে।
৪১৫ হিজরী দক্ষিণ মিশরে এক ব্যক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেই গোপনে খলিফা আল হাকিমের হত্যার দায়িত্ব স্বীকার করে। সে বলে আল্লাহ্র গৌরব অম্লান রাখার জন্যই সে একাজ করেছে। খলিফার সাত রংয়ের রক্তরঞ্জিত পোশাক পাওয়া যায় এবং তাঁর বাহনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তবে আরো সূত্রে একথা বলা হয় যে, তাঁর প্রাসাদ থেকে মুকাত্তম পর্বতে নৈশযাত্রার পর তিনি আর ফেরেননি, যদিও তাঁর মৃত গাধা ও রক্তরঞ্জিত পোশাক পাওয়া যায়। তার দেহ কোথাও উধাও করে দেয়া হয়েছে। দারাযীরা বিশ্বাস করে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন, আবার ফিরে আসবেন।

www.waytojannah.com

স্থাপত্য কীর্তি ঃ খামখেয়ালীর মাঝেও আল হাকিমের বেশ কিছু কীর্তি স্মরণযোগ্য। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিলেন। তাঁর পিতার তৈরী মসজিদ, যা আল কাহিরার উত্তর ফটকে বাব আন নসরে অবস্থিত এবং ৯৯১ সনে শুরু, সেই বিখ্যাত সুবৃহৎ জামে মসজিদ তিনি সম্পূর্ণ করেন ১০০৩ সালে। এই মসজিদই আল হাকিমের মসজিদ নামে পরিগণিত আজও। তিনি রাশিদিয়া মসজিদও নির্মাণ করেন। আর এই মসজিদেই তিনি জুমুআর সালাত আদায় করতেন। মাকসে পরকালের মসজিদ নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আর একটি মসজিদ নদীর কূলে নির্মাণ করেন।

দারুল হিকমা ঃ তবে তাঁর বড় কৃতিত্ব হোল দারুল ইলম বা দারুল হিকমা ১০০৫ সালে প্রতিষ্ঠা। মূলত শিয়া মতবাদ সুশৃঙ্খলভাবে প্রচার ও প্রসার কল্পে এই জ্ঞানকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই জ্ঞানগৃহে জ্যোতির্বিদ্যা, ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য, কবিতা, তুলনামূলক আইন, চিকিৎসাবিদ্যাসহ প্রয়োজনীয় জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ও শিক্ষায়তন রূপে গড়ে ওঠে। জ্ঞানী পণ্ডিত, গবেষক এবং বিভিন্ন চিন্তাবিদগণের এখানে বিপুল সমাবেশ ঘটে। এখানে জ্ঞানীগুণীদের যথার্থ কদর ও সম্মান করা হোত। উপহার উপঢৌকন দেয়া হোত। ফলে আল হাকিমের এ অবদান স্মরণীয়। এই দারুল হিকমাহ ৫১৩ হিজরী পর্যন্ত চলে এবং ঐ বছরেই সুন্নী উজির আফজাল এটা বন্ধ করে দেন। এই দীর্ঘ সময়ে দারুল হিকমা অনেক দার্শনিক, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলরূপে পরিগণিত হয়। এই সময় একজন প্রখ্যাত দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে, যিনি ইবনে হায়শাম এবং পাশ্চাত্যে আল হাজেন নামে সমাধিক পরিচিত। ৩৫৪ সালে বসরাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং গ্রীক দর্শনে খুবই পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি কায়রোতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। ৪৩০ হিজরীতে মারা যান। ইবনে হায়সাম অনেকগুলি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন তার তালিকা দীর্ঘ। গণিত, পদার্থ, আরাস্তর যুক্তিবাদ, গ্যালেনের চিকিৎসা প্রভৃতি খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি চক্ষু চিকিৎসা-বিষয়ক যে গ্রন্থ রচনা করেন ইউরোপের মধ্যযুগে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে তা পাঠ্য পুস্তক হিসাবে সমাদৃত।

দারুল হিকমাতে খলিফা একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার সংযুক্ত করেন। ফলে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ এবং নতুন গ্রন্থ প্রণয়ন উভয় কাজ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে করার ফলে দারুল হিকমা প্রাচ্যে আল মামুনের বায়তুল হিকমার ন্যায় প্রসিদ্ধি অর্জন করে। একদা আল হাকিম মুকাত্তম পর্বতে এক প্রকাণ্ড কাঠের স্তূপ সংগ্রহ করে তা আগুনে পোড়াতে থাকেন। অনেকে আতঙ্কিত হয়ে যায় এই জন্য যে, না জানি খেয়ালী খলিফা উক্ত অগ্নিকুণ্ডে কাদের বা নিক্ষেপ করেন। কিন্তু না, দেখা গেল তিনি কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্যে এ কাজটি করেছেন। খলিফা প্রখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ইবনে হায়শামকে দারুল হিকমার কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করার দায়িত্বে নিয়োগ করেন। ইবনে হায়সাম প্রায় এক শতখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দারুল হিকমাহর গ্রন্থাগারকে

www.waytojannah.com

সমৃদ্ধ করেন। সুন্নী পণ্ডিত আবু বকর আল আনতাকি, ঐতিহাসিক মুসাববীহি, বৈজ্ঞানিক আলী বিন ইউনুস এই দারুল হিকমার অন্যতম মনীষী ছিলেন। কারাফাতে একটা মানমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন খলিফা। একদিকে এশিয়ায় আল মামুনের বায়তুল হিকমাহ অন্যদিকে ইউরোপে কর্দোবার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রোকে যেন অনুপ্রাণিত করে আফ্রিকায় শিক্ষার স্রোত সৃষ্টি করতে।

দাওয়া বিভাগ ঃ খলিফা হলেন সকল দাওয়া কাজের উৎস। তাঁর পরে থাকতেন যিনি তাঁর উপাধি ছিল বাবআল আবওয়াব বা দাই–উদ দাওয়াত। অর্থাৎ প্রধান প্রচারক। তাঁর অধীনে ১২জন হুজ্জাস বারটি জেলার দায়িত্বে থাকতেন। তারপর দায়ীগণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে ফাতেমীয় শিয়া মতবাদ প্রচারকার্যে নিযুক্ত থাকতেন। দায়ীদের যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, বিশ্বস্ততা এবং একাগ্রতা ও আত্মনিবেদনের মাপকাঠিতে পদমর্যদা ছিল–দায়ী বালাগ, দায়ী মুতলাক, দায়ী মাহসুর। দায়ীদের সাহায্যকারীদের বলা হোত মাযহুনস। যারা প্রচার নিরাপত্তা এবং বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকত তাদের বলা হোত মুকাসিরস। যারা ইসমাইলীয় দলে সবে যোগ দিত তাদের বলা হোত আল মুমিন আল বালিগ। যারা ইসমাইলীয়দের সহানুভূতি দেখাত তাদের বলা হোত মুসতাজিব। এই দাওয়া কাজ চালানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল আহমদ হামিদুদ্দীন কিরমানীর উপর।

আহমদ হামিদুদ্দীন কিরমানী ঃ ইনি পারস্যের কিরমানে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবন বয়সেই প্রাচ্যে প্রধান দায়ীর পদে উন্নীত হন। আব্বাসীয়দের চরম বিরোধিতার মুখে তিনি ইরাক ও পারস্যে শিয়ামত প্রচারে সাফল্য অর্জন করেন। তিনি হুজ্জাতুল ইরাকাইন নামে পরিচিত। নাসাফী, রাজী ও সিজিস্তানীর মতাদর্শে কিরমানী প্রচারকার্যে সফলতা অর্জন করেন। ৩৯৭ হিজরীতে তিনি যখন মিশরে এলেন তখন মিশর দারুণ সংকটে নিপতিত। একদিকে প্লেগ, দুর্ভিক্ষ অন্যদিকে আবু রাকওয়ার আক্রমণ। এই সময় দারুল হিকমাহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং দাওয়া ও বিচার বিভাগের পরিচালক কাযী আব্দুল আযীয বিন মুহম্মদ বিন নুমানকে আবু রাকওয়ার সাথে যোগসাজসের অপরাধে হত্যা করা হয়।

৪০১ সালে দারুল হিকমাহ পুনরায় খুলে দেয়া হয় এবং দায়ী কিরমানীকে প্রধান প্রচারক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কিরমানী বিভিন্ন দেশে শিয়া মতবাদ প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যে অবদান রাখেন তা উল্লেখযোগ্য। জীবনের শেষের দিকে তিনি গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচিত ৩৯খানা গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্যঃ

১। রিসালাত আল ওয়াইজা–এটা দারায়ীদের বিরুদ্ধে লিখিত।

২। রিসালাত আল কাফিয়াহ–এটা উগ্র জায়দীদের বিরুদ্ধে লিখিত।

৩। আকওয়াল আল জাহাবিয়া–এটা গ্রীক মতবাদপুষ্ট দর্শনের বিরুদ্ধে লিখিত।

৪। কিতাব আল রিয়াদ–এটা ইসমাইলীয়দের আন্তঃ সম্প্রদায়ের কিছু গলদ সম্পর্কে লিখিত এবং ইসমাইলীয় মতবাদের সরলীকরণ সম্পর্কিত।

www.waytojannah.com

৫। রাহাত আল আকল—ইসমাইলীয় মতবাদকে সুষ্ঠু নিয়ম ও পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ। কিরমানী শিয়া ইসমাইলীয় মতবাদকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুষ্ঠু পদ্ধতির উপর পরিচালিত করার ক্ষেত্রে সর্বশেষ অবদান রাখেন। আল হাকিমের মৃত্যুর পূর্বেই কায়রোতে ৪০৮ থেকে ৪১১ হিজরীর মধ্যে কিরমানীর মৃত্যু হয়।

কৃতিত্ব ঃ আল হাকিমকে বিভিন্নভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। তাঁর নির্দেশ আর আদেশ ছিল গতানুগতিকের বিপরীত। ইসমাইলীয় মতবাদকে কড়াকড়িভাবে চালু করার জন্য তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলি ছিল সুন্নীদের বিরুদ্ধে। খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের প্রতিও তাঁর মিশ্র দর্শন ও ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ফলে তাঁর চিন্তাধারা একাধারে সুন্নী, খৃষ্টান ও ইহুদী কারমাতীয় প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিলক্ষিত হয়। কেবলমাত্র সংখ্যালঘু উগ্র ফাতেমীয় ভিন্ন কেউ তাঁকে সহজে গ্রহণ করে নিতে পারেনি। আর না পারাটাই স্বাভাবিক। এ কারণেই তিনি উদ্ধত, উগ্র এবং হিংস্র হয়েছেন। ফলে অনেক দক্ষ, অভিজ্ঞ, সেনানায়ক, বিচারক, আইনজ্ঞ, উজির, অর্থনীতিবিদ ও ইমামকে প্রাণ দিতে হয়েছে। জনগণকেও তাঁর নিষ্ঠুরতার শিকারে পরিণত হতে হয়েছে। দারায়ীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর প্রতি সকলের ক্রোধ ও রোষ দাবানলের মতো জ্বলে ওঠে। তবে তিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞান দর্শনের পৃষ্ঠপোষকতা করার দরুন তাঁর সৃষ্ট কিছু দুষ্টক্ষতের উপশম হয়। দারুল হিকমাহ, কুতুবখানা, মানমন্দির, মসজিদ, নতুন নগর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ফলে ফাতেমীয় শাসনকে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিতে আনতে তিনি সক্ষম হন। তবে তাঁর রহস্যজনক অনুপস্থিতি, ভ্রাম্যমাণ জীবন ও অজ্ঞাত মৃত্যু সবই অনেক কৌতূহল, গল্প ও মতবাদের জন্ম দিয়েছে। ফাতিমী মতবাদে যে রহস্য অনাবৃত এবং জনগণের কৌতূহল সৃষ্টি করে এই মতকে একটা রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে দাঁড় করিয়েছে, আল হাকিমের রহস্য-জনক অনুপস্থিতি ও অজ্ঞাত মৃত্যু এই মতবাদকে আরো রহস্যময় করে তোলার যথেষ্ট সুযোগ ও খোরাক দিয়েছে।

www.waytojannah.com

হিঃ ৪১১–৪২৭
খ্রীঃ ১০২১–১০৩৬

অষ্টম অধ্যায়

আবুল হাসান আলী আজ জাহির লী–ইজাজী–দীনিল্লাহ

৪১১ হিজরীতে কুরবানীর দিবসে খলিফা আল হাকিমের অদৃশ্য মৃত্যুর সপ্তম দিবস পর আবুল হাসান আল আজ জাহির লী ইজাজী দীনিল্লাহ ষষ্ঠদশ বর্ষ বয়সে মিশরের খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যদিও আজ জাহির খলিফা হন তথাপিও সুদীর্ঘ চার বছর যাবৎ সমস্ত ক্ষমতা তাঁর ফুফু সাইয়্যেদাতুল মুলকের হাতেই ন্যস্ত ছিল। তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন সেনাবাহিনীর সাহায্যে। সিংহাসন ও ক্ষমতাকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে সাইয়্যেদাতুল মুলক নৃশংসভাবে দুজন বিজ্ঞ উজিরের প্রাণসংহার করে। শুধু তাই নয়, এই চার বছরে তিনি আরো অনেক নিষ্ঠুরতার নজীর স্থাপন করেন। ৪১৬ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। রাজ ক্ষমতার অধিকারিণীর মৃত্যুর পর দরবারে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র প্রকট হয়ে ওঠে। তিনজন প্রভাবশালী শাইখ খলিফাকে বেষ্টন করে রাখেন। তাঁকে কেবল আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসাবে পরিণত করে সকল প্রকার শাসন থেকে দূরে রাখেন। দিনে নির্ধারিত সময়ে তাঁরা নিয়মিত খলিফার সাথে দেখা করে তাঁদের সকল কর্মকান্ডের অনুমোদন নিতেন। কিন্তু রাজ্যের অবস্থা অবনতির দিকে যেতে থাকে।

সাইয়্যেদাতুল মূলকের মৃত্যুর বছরে নীল নদের বিরূপ প্রবাহে দেশে দারুণ অজন্মা দেখা দেয়। ফলে দেশে আকাল আর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে। দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায় আর খাদ্যদ্রব্য দিন দিন মহার্ঘ হয়ে ওঠে। ষাঁড়ের মূল্য ৫০ দিনারে উন্নীত হয় এবং ষাড় নিশ্চিহ্নের আশঙ্কায় জবাই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। উট আর মিশরের সাধারণ মাংস মুরগীও দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। জনসাধারণ আসবাবপত্র বিক্রয় করে খাদ্য সংগ্রহ করতে চাইলেও ক্রেতা পাওয়া যায়নি। দুর্বল, দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণী খাদ্যের অভাবে অধিকাংশই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সবলেরা দস্যুবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে। বাণিজ্য কাফেলা এবং এমনকি হজ্বযাত্রীদের মালপত্র লুণ্ঠনেও তারা ইতস্ততঃ করেনি। চলার পথ বিপদসঙ্কুল হয়ে ওঠে।

সুযোগ বুঝে সিরীয় বিদ্রোহীরাও সীমান্তে এসে হানা দেয়। সর্বদিক দিয়ে মিশরের অবস্থা ভীষণ নাজুক অবস্থায় নিপতিত হয়। জনগণ দলে দলে খলিফার প্রাসাদ সন্নিকটে এসে আর্তচিৎকার করত– ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার্ত, হে আমিরুল মুমিনীন! এমনটি না ছিল আপনার পিতা অথবা না ছিল আপনার প্রপিতার সময়ে!

দাসদাসীদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়ে। ক্ষুধার তাড়নায় তারাও দলে দলে রাস্তায় বের হয় ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণের অন্বেষায়। রাস্তাঘাট জনগণের চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। অনেক স্থানে জননিরাপত্তা বিধানে নিরাপত্তা কমিটি গঠিত হয়।

www.waytojannah.com

সরকার এই কমিটির হস্তে অস্ত্র তুলে দেয় বিদ্রোহী ক্রীতদাসদের প্রতিহত করার জন্য।

দেশে যখন চরম আকাল আর খাদ্যসংকট তখন প্রাসাদেও প্রাচুর্যের ভাটা পড়ে। খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়, সরবরাহ দারুণভাবে হ্রাস পায়। যখন খাবার টেবিল সাজানো হোত তখন শত শত বুভুক্ষ দাসদাসীরা টেবিল ঘিরে ফেলত। প্রাসাদেও নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। কার্যতঃ রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য হয়ে পড়ে। খাজনা বকেয়া আর আদায় অসম্ভব। এসব মিলে সারা মিশরে দুর্ভিক্ষ চরমে পৌঁছে। অবস্থা আরো বেগতিক হয়ে পড়ে ৪১৮ হিজরীতে যখন খলিফা আল হাকিম কর্তৃক দণ্ডিত ও কর্তিত হস্তের অধিকারী উজির আলী বিন আহমদ আল জারজারাইকে পুনরায় উজির পদে বহাল করা হয়। কায়রোর রাজপথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয় যাতে ডাকাত দস্যু ও বিদ্রোহী ক্রীতদাসেরা নগরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করতে পারে। উজিরকেও প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় অবস্থান করতে হয়। অবশেষে ৪১৯ হিজরীতে নীল নদের শুভ প্রবাহের ফলে প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয়। ক্রমে ক্রমে দুর্ভিক্ষ অবস্থার অবসান ঘটে এবং গোলযোগ বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। দেশে আবার শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। নগরে নগরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হয়।

৪১৬ হিজরীতে ফাতেমীয় খলিফা মিশরের মালেকী মাযহাবের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে নিষ্ঠুর ও নির্মম ফরমান জারী করেন। এ মাযহাবের বড় বড় পণ্ডিত হাদীস শাস্ত্রবিদ ও ফকিহদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। গ্রন্থ অধ্যায়ন নিষিদ্ধ করা হয়। মিশরের উচ্চভূমিতে মালেকী মাযহাব আর নিম্নভূমিতে শাফেয়ী মাযহাবভুক্ত সুন্নী মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু ফাতেমীয়রা কোন মাযহাবের প্রতি নমনীয় না হয়ে কট্টর শিয়া মাযহাবকে শক্তিপ্রয়োগে মিশরে প্রচলন করার নীতি গ্রহণ করেন। ইমাম জাফর আস-সাদিকের আইনগুলিই বৈধ বলে ঘোষিত হয়। অন্যান্য সুন্নী আইনের কার্যকরিতা বিলুপ্ত করা হয়।

৪১৮ হিজরীতে খলিফা গ্রীক সম্রাট অষ্টম কনস্টানটাইনের সাথে একটা মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিতে ঘোষিত হয় যে সমগ্র গ্রীক সাম্রাজ্যে খলিফার নামে মসজিদে খুৎবা পঠিত হবে এবং কনস্টান্টিনোপলে মসজিদ পুনর্নির্মিত হবে যা ইতি-পূর্বে বিধ্বস্ত করা হয়। চুক্তিতে এটাই উল্লেখিত হয় যে, জেরুযালেমে আবার পুনরুত্থান গীর্জা পুনর্নির্মিত হবে যা ইতিপূর্বে ভেঙে ফেলা হয়েছিল।

খলিফা জাহিরের সিংহাসন আরোহণের সময় সিরিয়াতে ফাতেমীয় আধিপত্য খুব মজবুত ছিল না। তবে এ সময় কাইসারিয়ার শাসনকর্তা আনাশতাগীন আদ দীজবীরি তাঁর যোগ্যতা ও কৌশলগত দক্ষতার ফলে সিরিয়ার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে ফাতেমীয়দের অনুকূলে আনেন। তাঁর প্রথম কাজ ছিল আরব গোত্রপতি সালিহ বিন মিদরাজের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ, যিনি মুরতাযার নিকট থেকে আলেপেপা অধিকার করে স্বাধীনভাবে শাসন করছিলেন।

৪২০ হিজরীতে আনাশতাগীন তিরিবিয়াসের সন্নিকটে সালিহকে আক্রমণ করে

পরাজিত ও নিহত করেন। অতঃপর বিদ্রোহী হাসান বিন মুফারবাজকে মুকাবেলা করে তাঁকে পলায়ন করতে বাধ্য করেন। খলিফা আল জাহিরের রাজত্বের শেষের দিকে ফাতেমীয় প্রভাব সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে অত্যন্ত ফলপ্রসূরূপে প্রতিভাত হয়। এশিয়ার এতদঞ্চলে শিয়া প্রভাব কার্যকররূপে প্রতিষ্ঠা করার পিছনে আনাশতাগীনের প্রচেষ্টা, কৌশল ও সামরিক দক্ষতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খলিফা জাহির পিতার ন্যায় নির্মম ও নিষ্ঠুর যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন বিলাসী, আরামপ্রিয় আর নৃত্য সংগীত প্রমোদপিপাসু। সুর সংগীত আর নৃত্যে তাঁর বিলাসী জীবন কেটে যেত দিনের পর দিন। তবে ৪২৪ হিজরীতে তিনি যে চাঞ্চল্যকর নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করেন তা মনে হয় জগতের পূর্বাপর অনেক নিষ্ঠুরতাকে ছাড়িয়ে গেছে। তিনি একটা আনন্দ উৎসবে ভোজের ব্যবস্থা করেন। আর এই আনন্দঘন পরিবেশকে নাচগানে উপভোগ্য করে তোলার জন্য ২৬৬০ জন বালিকাকে আমন্ত্রণে উপস্থিত করেন। তাদেরকে ভোজে আপ্যায়িত করার জন্য একটি মসজিদে সমবেত করে সমস্ত দরজা জানালাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাইরে থেকে দরজা জানালাগুলি ইট দিয়ে গেঁথে প্রাচীরের ন্যায় করা হয়। ফলে মসজিদ অভ্যন্তরে ঐ বালিকাগুলিকে আটকিয়ে, না খেতে দিয়ে মেরে ফেলা হয়। কি পৈশাচিক নির্মমতা আর নিষ্ঠুরতা! বনি আদমকে এমনি করে জ্যান্ত কবর দেয়া হয় একটি মসজিদ! দীর্ঘ ছয় মাস ধরে এ মসজিদকে আর উন্মুক্ত করা হয়নি। বাইরের জগৎ এর প্রতিবাদে কোন ঝড় তুফানও তোলেনি। কারণ মানুষকে দাস-দাসী করে যারা ভোগ্যের সামগ্রী রূপে ব্যবহার করত তারাও খলিফা। তাদের মনোরঞ্জনে যারা দেহ দিত— তারা প্রাণ দেবে এ যেন কৌতুক ও নির্মম পরিহাস। এই নিষ্ঠুর বর্বর হত্যাকাণ্ডের পর জাহিরকেও প্লেগে প্রাণ দিতে হয় ৪২৭ হিজরীতে।

www.waytojannah.com

৪২৭–৪৮৭ হিঃ
১০৩৫–১০৯৫ খ্রীঃ

নবম অধ্যায়

আবু তামিন আল মুসতানসির বিল্লাহ

খলিফা আল জাহিরের মৃত্যুর পর ৭ বছর বয়স্ক পুত্র আবু তামিন আল মুসতানসির বিল্লাহ ১৫ই সাবান ৪২৭ হিঃ মুতাবিক ১৪ই জুন ১০৩৫ খ্রীঃ অষ্টম খলিফারূপে ফাতিমীয় খিলাফতের দায়িত্বে সকলের আনুগত্য গ্রহণ করেন। মুসলিম ইতিহাসে এত দীর্ঘ সময় ধরে কোন শাসক ক্ষমতায় টিকে থাকেনি। তিনি সুদীর্ঘ ছয় দশকব্যাপী ফাতিমীয় সিংহাসনে ছিলেন। তাঁর সময়ে যেমন ফাতিমীয় ক্ষমতার সুদূর ব্যাপ্তি ঘটে তেমনি ক্ষমতার ক্ষয়িষ্ণু চিড় ধরে শাসনের শেষ দশকে। ফাতেমীয়দের ধর্মীয় ধারণায় যে ইমামত সেখানে উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্ন অবিচ্ছিন্ন। বয়স বা যোগ্যতার ব্যাপারটি নিত্যান্ত গৌণ। তাই নাবালক হওয়ার কারণে অনেক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি সুযোগ মতো ক্ষমতার ব্যবহার ও অপব্যবহার দুই–ই করেছেন।

আল মুসতানসিরের নাবালকত্বের সুযোগে আবারও নারীর ভূমিকা মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। কায়রোতে আবু সাদ আব্রাহাম ও আবু নসর সাদ আজ জাহির নামে সাহলের দুই পুত্র ছিলেন। এরা জাতিতে ইহুদী ও পেশায় ব্যবসায়ী। সাদ আজ জাহিরের নিকট হতে ভূতপূর্ব খলিফা আজ জাহির একটা সুদানী কৃষ্ণ ক্রীতদাসী খরিদ করেন। আর এই কৃষ্ণ ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তানই খলিফা আল মুসতানসির। এই নাবালক খলিফার অভিভাববিকারূপেই তাঁর সুদানী মাতা প্রশাসনকে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে খলিফা–মাতার ক্ষমতা ও প্রভাবকে মন্ত্রী জারজারাই যতদিন ছিলেন ততদিন ভালভাবে সুসংযত করে রাখেন। অতঃপর ৪৩৬ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হলে এ প্রভাব অবাধ গতি পায় ও সাথে যুক্ত হয় আরো পার্শ্ব প্রভাব।

খলিফা আল হাকিমের সময় তুর্কী আর নিগ্রো দেহরক্ষী বাহিনীর সৃষ্টি হয়। আগেকার বার্বার ও তুর্কী বাহিনীর দ্বন্দ্বের স্থলে এখন নতুন সংঘর্ষ শুরু হয় তুর্কী ও নিগ্রোদের মধ্যে। যদিও আরব ও বার্বার সমর্থন তুর্কীদের পক্ষে ছিল তবুও খলিফা–মাতা নিগ্রো হওয়ায় তাঁর জোর সমর্থন নিগ্রোরা লাভ করে। ফলে সংঘাতটি তীব্র হয়ে দেখা দেয়। উজির জারজারাই মিশরে শান্তি–শৃঙ্খলা, উন্নতি এবং সমৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তবে সিরিয়াকে মিশরের শাসনাধীনে পুরাপুরি রাখার সফলতাতেই তাঁর কৃতিত্ব বেশী। সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল আলেপ্পোকে কেন্দ্র করে। আল হাকিম ৪০৬ হিজরীতে আজিজ আদ দৌলাকে আলেপ্পোর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁর আচরণ ও কার্যক্রম আদৌ খলিফার জন্য সন্তোষজনক ছিল না। তার দুর্গ নির্মাণ, গ্রীকদের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন এবং মিশরে কর প্রদান বন্ধ করে দেওয়া

www.waytojannah.com

প্রভৃতি পদক্ষেপ মিশরীয় খলিফাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। খলিফা আল হাকিম তাঁর বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর ফলে অভিযান প্রেরিত হয়নি। আজ জাহিরের সাথে আজিজ আদ দৌলা একটা সুসম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হন। তবে দুর্গাধিপতি বদরের দ্বারা ৪১৩ হিজরীতে আজিজের জীবনাবসান ঘটে এবং বদর স্বভাবতই মনে করেছিল গোটা আলেপ্পো তার করায়ত্তে চলে আসবে, কিন্তু ফাতেমীয় খালিফা তাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। তাকে তার দায়িত্ব থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং আলেপ্পোতে দুজন গভর্নর নিয়োগ করা হয়। একজন নগরে অন্যজন দুর্গে। সালেহের পুত্র মুইজ আদ দৌলা এবং শিবল আদ দৌলাকে এমনিভাবে আলেপ্পোতে ক্ষমতাসীন করা হয়। পরবর্তীকালে শিবল আদ দৌল্লাকে খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং গ্রীকদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে আলেপ্পো হতে তাদেরকে তাড়িয়ে দেন।

৪৩৬ হিজরীতে উজির আল জারজারাই মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পরের বছর আনাশতাগীনের জীবনাবসান ঘটে। ফলে মিশর অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দুজনকে হারিয়ে তার সমৃদ্ধি ও শক্তির সুদিন যেন হারিয়ে ফেলে। দরবারে আবারও শুরু হয় জাতিগত সংঘর্ষ। নিগ্রো–তুর্কী দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দেয়। পরবর্তী উজির হন ইবনে আল আনবারী। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই হেরেমের ষড়যন্ত্রে তাঁকে ক্ষমতা হারাতে হয়। আবু মনসুর সাদাকাকে নতুন উজির নিয়োগ করা হয়। ৪৪০ হিজরীতে ইবনে আল আনরাবীকে হত্যা করা হয়। এবং নতুন উজিরও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়। পরবর্তী ছয় বছরে বেশ কজন উজিরের উত্থান–পতন ঘটে। অবশেষে ৪৪২ হিজরীতে আল ইয়াজুরী নামে এক ধীবর বংশজাত অত্যন্ত যোগ্য ও দক্ষ উজিরের হাতে মিশরের শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হয়। প্রায় ৮ বছর ধরে তিনি মিশরের ক্ষমতায় ছিলেন।

আল ইয়াজুরী বেশ উদ্ভাবনী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে জনসাধারনের কল্যাণ করতে আগ্রহী হন। কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় তাঁর ইচ্ছা সুফল আনতে পারেনি।

প্রথমতঃ তিনি সরকারী গুদামে সঞ্চিত খাদ্য উন্মুক্ত বাজার দরে বিক্রি করার নির্দেশ দেন এবং ব্যবসায়ীদেরকেও একইভাবে বাজারে খাদ্য বিক্রয়ের কড়া নির্দেশ দেন। ফলে সারা দেশে খাদ্যমূল্য হ্রাস পেল। জনসাধারণ তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের সুযোগ পেল এবং তারা খুবই সুখী হোল। কিন্তু এ সময়ে আবারও নীল নদের প্রবাহ হ্রাস পায় এবং দেশে আবারও দারুণ খাদ্য–সংকট দেখা দেয়। দেশে দুর্ভিক্ষ শুরু হোল। রাজস্ব অনাদায় এবং খাদ্যের অভাবে ও মারাত্মক প্লেগের প্রাদুর্ভাবে জনগণের মাঝে হাহাকার চরমে পৌছায়। খাদ্য ঘাটতি নিরসনের জন্য তিনি গ্রীক সম্রাট কনষ্টানটাইন মনোম্যাকোসের নিকট হতে খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা করেন। জরুরীভিত্তিতে খাদ্য আমদানীর ফলে পরিস্থিতির বেশ উন্নতি হয়। ৪৪৭ হিজরীতে সম্রাটের মৃত্যু পর্যন্ত খাদ্য আমদানীর প্রবাহ অব্যাহত থাকে। নতুন সম্রাজ্ঞী থিডোরা কিন্তু এই খাদ্য চুক্তি বাতিল করে অনেক নতুন শর্ত যুক্ত করে খাদ্য রপ্তানীর কথা

www.waytojannah.com

বলেন। উজির এই শর্তগুলি মানতে অস্বীকার করেন, ফলে গ্রীকদের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি হয়। খাদ্য সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় যে এ সময়ে নীল নদের অবদানের অত্যন্ত ভাল ফসল জন্মায়। প্রচুর খাদ্যে মিশরের গুদামগুলি আবার পূর্ণ হয়। সরকারী গুদামগুলি আবার তিনি ভবিষ্যতের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য পূর্ণ করে রাখেন। ক্ষেতের ফসল যাতে ফড়িয়া বা ফন্দিবাজ অসাধু ব্যবসায়ীরা পূর্বাহ্নে ক্রয় না করতে পারে সে জন্য তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। চাষীদেরকে প্রতারণা ও অনটনের হাত হতে রক্ষার জন্য সরকারী ক্রয়কেন্দ্রের মারফত খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে নায্য মূল্যে বাজারে রাখতে সক্ষম হন।

কৃষি নীতিতে উজির আল ইয়াজুরী অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। যাতে কৃষকের উপর ভারী বোঝাস্বরূপ না হয় সেদিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল বেশী।

ইহুদী খ্রীষ্টান যারা ইতিপূর্বে মিশরের প্রশাসন ও অর্থনীতির উপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে দারুণ নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছেন এবং আন্তঃবাহিনীর কোন্দলকে জিইয়ে রেখে শান্তি–শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেছেন তাদের প্রতি উজির ছিলেন অত্যন্ত নির্দয়। কিব্‌তী ধর্মযাজককে বন্দী করেন এবং গোটা কিবৃতী সম্প্রদায়ের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করেন। কারণ তারা নতুন কৃষিনীতির বিরোধী ছিল।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরণের অভিযোগ উথাপন করেন। যদিও উজির তাঁর বৈধ আয় অপেক্ষা অনেক বেশী সম্পদের মালিক হন, তথাপিও রাষ্ট্রের জন্য তাঁর কাজগুলি ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধ অভিযানে সম্মত ছিলেন না। অহেতুক সমরাভিযান পরিহার করে দেশের অগ্রগতি সাধনে তাঁর চিন্তা ছিল বেশী। যদিও এ সময়ে মিশরের ক্ষমতা নিতান্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে। উত্তর আফ্রিকা প্রায় হাতছাড়া। আব্বাসীয়দের সাথে ফাতেমীয়দের সামরিক সংঘর্ষ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। রাণীমাতার অদৃশ্য হাত তখন শাসনে নানাভাবে প্রভাব ফেলছে। এই বিজ্ঞ উজির ৪৪৯ হিজরীতে প্রাণত্যাগ করেন। অনেকের ধারণা হেরেমের ইঙ্গিতে বিষপ্রয়োগে তাঁর জীবনাবসান হয়। আবার কেউ বলেন তাঁকে গুপ্ত ভাবে হত্যা করা হয়।

৪৪৯ হিজরীতে আল ইয়াজুরীর মৃত্যুর পর থেকে ৪৬৬ হিজরী পর্যন্ত এই ১৬ বছরে ফাতেমীয় রাষ্ট্রে দারুণ সংকট চলতে থাকে। ১৬ বছরে ৪০ জন উজির আর ৪২ জন কাযীর উথান–পতন ঘটে। প্রতিদিনেই ৮০০০ অভিযোগ খলিফার নিকট জমা হোত প্রশাসনের বিরুদ্ধে। এই সময়ে তুর্কী সেনাপতি নাসিরুদ্দৌলার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি খুবই বৃদ্ধি পায়। রাণীমাতা নিগ্রোদের সমর্থন করতেন ও শক্তি যোগাতেন, ফলে তুর্কীদের সাথে তাদের সংঘর্ষ নিয়ত লেগেই থাকত। ৪৫৪ হিজরীতে নাসিরুদ্দৌলা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে নিগ্রোবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে উত্তর মিশরে তাড়িয়ে সেখানেই আটকে রাখেন বেশ কয়েক বছর। যদিও তারা অনেক বার চেষ্ট করেছে প্রতিশোধ নেবার, কিন্তু পারেনি। বিজয়ী তুর্কীরা কায়রো দখল করেই রাখে, আর উজির রদবদলের যন্ত্ররূপে কাজ করতে থাকে। খলিফা মুসতানসিরও তাদেরকে ভয় করতেন। তুর্কীদের বেতন প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। অবশেষে

www.waytojannah.com

নাসিরুদ্দৌলার নিষ্ঠুরতা ও স্বৈর ক্ষমতার জন্য তাঁর নিজস্ব অফিসার গণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। খলিফা এই সুযোগটি হাতছাড়া করেননি। তিনি ৪৬২ হিজরীতে তাঁকে অপসারিত করেন। কিন্তু কায়রো হতে বিতাড়িত হলেও আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে নাসিরুদ্দৌলা পুরো মাত্রায় তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন। ফলে খলিফার ক্ষমতা শুধুমাত্র কায়রোয় সীমিত হয়ে পড়ে। আবার এই সময় খাদ্য–সংকট দেখা দেয়, অভাব অনটন প্রকট আকার ধারণ করে। নগরে একটা বাড়ী ২০ পাউন্ডে কেনা যেত। একটি ডিম এক দীনারে বিক্রয় হোত। ১৫ দীনারে একখণ্ড রুটি পাওয়া দুষ্কর ছিল। ঘোড়া, খচ্চর, বিড়াল, কুকুর দুর্লভ হয়ে পড়ে। খলিফার পশুশালায় একদা যেখানে ১০,০০০ প্রাণী মৌজুদ ছিল সেখানে তিনটি ক্ষীণকায় অশ্ব। খলিফার সহচরদের প্রায় সকলেই খাদ্যের অন্বেষায় রাজদরবার ত্যাগ করেছিল। রাণীমাতাসহ অনেকেই কায়রো ছেড়ে বাগদাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নরমাংস পর্যন্ত কায়রোর বাজারে খাদ্য হিসাবে বিক্রয় হয়। পথচারীদের সর্বস্ব লুণ্ঠনের জন্য ডাকাতেরা পথে ওৎ পেতে থাকত। খাদ্যাভাবে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। প্লেগের ভয়ে ঘরগুলি শূন্য হয়ে পড়ে। একদা খলিফা মুসতানসিরের রাজকোষ অর্থসম্পদে পূর্ণ ছিল, তা এখন সবই শূন্য।

তুর্কী সৈন্যদের দৌরাত্ম্য এত দূরে পৌঁছায় যে রাজকোষে সঞ্চিত মূল্যবান সম্পদ, ধনরত্ন, মূল্যবান পাত্র, কারুকার্য খচিত শিল্পকলা তারা নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করত আবার প্রায় তারাই ক্রেতারূপে এগুলি দখল করত। তিন লক্ষ দীনার মূল্যের মূল্যবান মনিকাঞ্চন এক সেনাপতি মাত্র ৫০০ দীনারের বিনিময়ে গ্রহণ করে। তুর্কীদের বেতনের দাবীতে এক পক্ষকালের মধ্যেই তিন কোটি মুল্যের ৪৬০টি মূল্যবান দ্রব্য বিক্রয় করা হয় নামমাত্র দরে। এছাড়াও উচ্ছৃংখল তুর্কীদের কার্যকলাপের ফলে বহু সম্পদ বিনষ্ট হয়। বছরের পর বছর ধরে সঞ্চিত কায়রোয় গ্রন্থাগারের এক লক্ষ পুস্তক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা হয়। আবার আগুন জ্বালানোর জন্যও এগুলি পোড়ানো হয়।

এ দুর্দিনে নাসিরুদ্দৌলা তাঁর তুর্কী বাহিনী নিয়ে কায়রো আক্রমণ করেন। তুর্কীদের মধ্যে আবার আন্তঃগোত্রীয় সংঘর্ষ বেধে যায়। ফুসতাত নগরী প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অবশেষে নাসিরুদ্দৌলা তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের পরাজিত করে কায়রোতে যখন প্রবেশ করেন তখন দেখেন খলিফা নিত্যান্ত দীন হীন বেশে একটা কক্ষে জরা–জীর্ণ শয্যায় দিন যাপন করছেন। মাত্র তিন জন সেবিকা আর দিনে দুখণ্ড রুটি। তাও ব্যাকরণবিদ মহানুভব বাবশাদ কর্তৃক প্রেরিত। নাসিরুদ্দৌলা মুমূর্ষ নগরীতেও তাঁর বর্বরোচিত হামলা বন্ধ করেননি। ফলে তাঁরই সহচরদের দ্বারা ৪৬৬ হিজরীতে তিনি নিহত হন। এ সময় কায়রো ছিল অত্যন্ত হতভাগ্য নগরী আর এর অধিবাসীরা ছিল নিত্যান্ত দারিদ্র্য প্রপীড়িত নিরাপত্তাহীন অসহায়।

বদর আল জামালী ঃ দামেস্কে ফাতিমীয় গভর্নর আমির জামিল উদ্দীনের অধীনে বদর নামে একজন আরমেনীয় ক্রীতদাস ছিল। স্বীয় দক্ষতা যোগ্যতা ও প্রতিভাবলে নিজ অবস্থা হতে অত্যন্ত সম্মানিত স্থানে উপনীত হন। জামাল উদ্দীন তাকে সেনাবাহিনীর উক্ত পদে নিয়োগ করেন। পরে কয়েকটি পদোন্নতি পেয়ে তিনি আক্কার শাসন কর্তা হন।

www.waytojannah.com

স্বীয় প্রভুর নামানুসারে নিজকে আল জামালী নামে অভিহিতে করেন। বদর আল জামালী অত্যন্ত শক্তিশালী সাহসী এবং ফাতিমীয় ভক্ত ছিলেন। খলিফা মুসতানসির যখন প্রায় বন্দীদশায় অসহায়ভাবে বিধ্বস্ত কায়রোতে অবস্থান করছিলেন, তখন অকস্মাৎ তার হৃদয়ে জাগ্রত হোল সাহসিকতার দুর্দমনীয় শক্তি। তিনি যেন ঘুমন্ত সিংহ যেমন জাগ্রত হয়ে হুংকার দিয়ে সমস্ত বনানী তোলপাড় করে তোলে ঠিক তেমনি যেন একেবার নড়ে উঠলেন। তিনি বদর আল জামালীকে আহ্বান করলেন তাকে সাহায্য করতে। বদর আল জামালী খলিফাকে লিখলেন— তিনি আসতে প্রস্তুত তবে তাকে তার নিজস্ব সৈন্যসহ আসতে হবে এবং তার আগমন খুবই গোপন রাখতে হবে। খলিফা সম্মত হলেন তাঁর শর্তে।

অতঃপর বদর আল জামালী তাঁর আরমেনীয় সৈন্য নিয়ে পোর্ট সৈয়দ অর্থাৎ তিন্নিস দিয়ে দ্রুত বেগে মিশরে প্রবেশ করলেন। খলিফাকে দিয়ে কায়রোর তুর্কী সেনাপতি ইলদিগুজকে বন্দী করলেন। মিশরীয় গোত্রগুলির সমর্থন লাভ করে তিনি কায়রোর হিতাকাঙ্খীরূপে আবির্ভূত হলেন। অতঃপর রাজধানীতে তুর্কীদের সুহৃদরূপে আচরণ দেখালেন আর খলিফাকে দিয়ে সমস্ত তুর্কী পদস্থ অফিসারদেরকে এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানালেন। সবাই যখন ভোজের জন্য আমন্ত্রিত তখন বদর আল জামালী অত্যন্ত কৌশলে গুপ্তঘাতকের দ্বারা প্রত্যেক তুর্কী অফিসারকে হত্যা করেন।

এবার তাঁকে প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগ তদারকির দায়িত্ব দিলেন খলিফা। কেবলমাত্র দাওয়া বিভাগ তাঁর আওতার বাইরে রইল। কেননা দাওয়া বিভাগের প্রধান ছিলেন আল মুয়াইদ। তিনিই পরামর্শ দেন বদর আল জামালীকে আমন্ত্রণ করতে। অল্প সময়ের মধ্যে বদর শান্তি–শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করেন। নিম্ন ও উচ্চ মিশর সবটাই তিনি দখল করেন। বদর আল জামালী সিরিয়ার প্রসিদ্ধ নগরী ত্রিপলী ও আসকালন দখল করেন। ৪৬৬ হিজরীতে মিশরে খুবই ভাল ফসল উৎপন্ন হয় এবং জনগণের দীর্ঘ দিনের অনটন ও খাদ্যাভাব দূর হয়। এই বছরেই বদর আল জামালী মিশরে আগমন করেন। ফলে তাঁর এই আগমনকে শুভবর্ষ হিসাবে পরিগণিত করার লক্ষ্যে খলিফা কায়রোতে একটি সুবৃহৎ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। বদর আল জামালী অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা, শিল্পানুরাগী, স্থাপত্য শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন গুণী লেখকও ছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করেন। এছাড়াও অনেক মিনার এবং মসজিদের নির্মাতা তিনি। তাঁর নির্মিত বিখ্যাত ইমারত বা সৌধমালার মধ্যে কায়রোর তিনটি প্রবেশ তোরণ আজও অক্ষত অবস্থায় নির্মাতার নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। তোরণ তিনটি হোল বাব আন নসর, বার আল ফুতুহ ও বাব আল জুয়াইলা। নগর প্রাচীরও তাঁর কীর্তি। তাঁর সংকলিত বক্তৃতামালা গ্রন্থাগারে “মাজালীস” নামে বিখ্যাত। ফলে অসিতে আর মসীতে তাঁর দক্ষতা সত্যিই স্মরণযোগ্য।

৪৭১ হিজরীতে বদর তার একক ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে যান। এই সময়ে শিয়া দায়ী আসাসীন নেতা হাসান বিন সাব্বাহ কায়রো সফরে আসেন। কিন্তু খলিফার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ব্যাপারে বদরের সাথে তাঁর মত বিরোধ ঘটে। ফলে তাঁকে

www.waytojannah.com

মিশর থেকে অবিলম্বে চলে যেতে হয়। হাসান পারস্যে গিয়ে আলামুত পর্বতমালায় তাঁর সুরক্ষিত আস্তানায় নাজারীয়া মতবাদ প্রচার করতে থাকেন।
৪৮৩ সালে বদর মিশর ও সিরিয়াতে নতুন কর ধার্য এবং আদায়ের পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। তাঁর নতুন নিয়ম প্রবর্তনের ফলে কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০০০০ দীনার থেকে ৩১০০০০০ দীনারে উন্নীত হয়। সমস্ত মিশরে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি বিরাজ করতে থাকে। ৪৮৭ হিজরীতে বদর আল জামালী ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর খলিফা ইরানী বংশোদ্ভূত লাউন আমিন আদদৌলাকে উজির নিয়োগ করেন। কিন্তু দুর্বল চিত্তের অধিকারী এ উজির বেশী দিন স্বীয় পদে থাকতে পারেননি। বদর আল জামালীর পুত্র আফজাল শাহীন শাহ নিজকে উজির হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে অর্থাৎ ৪৮৭ হিজরীতে খলিফা আল মুসতানসির মৃত্যুবরণ করেন ৬০ বছর শাসনকার্য চালিয়ে।

খলিফা মুসতানসীরের সময়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ

নাসির-ই-খসরু ঃ—খুরাশানের বলখ শহরের সন্নিকটে এক পল্লীতে ৩৯৪ হিজরীতে নাসির-ই-খসরুর জন্ম হয়। তিনি শিয়া পরিবারেরই সন্তান। প্রথমতঃ তিনি ও তাঁর ভাই গজনীর দরবারে চাকুরী গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ মতবাদের কারণে গজনীর দরবার ছেড়ে তিনি পরিব্রাজকের নেশায় পথে বেরিয়ে পড়েন। ৪৩৭ হিজরীতে নিজ শহর ছেড়ে তিনি দু বছর পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ভ্রমণ করে অবশেষে ৪৩৯ হিজরীতে মিশরে ফাতেমীয় দরবারে উপস্থিত হন। যদিও সে সময় মিশরের অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না তবুও তাঁর দেখা অন্যান্য শহর থেকে মিশরকে তাঁর অনেক ভাল মনে হয়। প্রচারক মুয়াইদ ঐ একই বছরে মিশরে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে ওঠে। নাসির অনেক কবিতা লেখেন এবং মুয়াইদের প্রভাব যে তাঁর উপর খুবই বেশী ছিল তা তার রচিত কাব্যে সুস্পষ্ট। খলিফার সাথে দেখা করলে খলিফা তাঁকে স্বদেশে ফিরে ফাতেমীয় মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগের কথা বলেন। ৪৪৪ হিজরীতে তিনি পারস্যে পৌছান, কিন্তু শীঘ্রই সেলজুকরা তাকে শত্রু বিবেচনা করে অনুসরণ করতে থাকে। অবশেষে ভ্রমণ করতে করতে তিনি মধ্য এশিয়ার বাদাখশানের পার্বত্য এলাকা ইয়ামঘানে উপস্থিত হন। এখান হতে ইসমাইলীয় মতবাদ খোরাশানে প্রচারকল্পে প্রচারকদল প্রেরণ করতে থাকেন। এখানে বসেই তিনি তাঁর প্রায় সব লেখনী সমাপ্ত করেন এবং ৪৭০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। একজন বিখ্যাত পারস্য জাতীয় লেখক হিসাবে তিনি কীর্তিমান। তিনি স্বদেশী ফ্রাসী ভাষায় তাঁর সব চিন্তাধারা লিখেছেন। তাঁর প্রধান লেখা হোল 'সফর নামা', যা তাঁর জীবনের ভ্রমণকাহিনী সম্বলিত। সেই সময়কার ইতিহাস, ভূগোল এবং ব্যবসা, বাণিজ্যের বিষয় তাঁর সফর নামায় বিধৃত। তাঁর রচিত কবিতাও অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'দিউয়ান' আজও কাব্যমোদীদের নিকট সুপরিচিত। তার সুফী দর্শন ও জীবন কর্ম ইসমাইলীয় মতবাদপুষ্ট। তাঁকে অনেকে সাধক হিসাবেও চিহ্নিত করেছেন।
নাসির-ই-খসরু মিশরে ভ্রমণ করে খলিফা মুসতানসিরের সময়ে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপঃ-দূর থেকে মিশরকে দেখাত একটি সাত থেকে চৌদ্দতলাবিশিষ্ট ইমারত

শ্রেণী সমন্বয়ে পর্বতমালা সদৃশ। নগরের সড়কগুলি প্রশস্ত আর আলোকমালায় সজ্জিত। আলোর মেলায় মিশর ছিল নয়নাভিরাম। নানা আকার প্রকারে এবং কারুকার্যে বাতি ও ঝাড়বাতি ছিল মনোমুগ্ধকর। ফল শাকশব্জীর বাজারে এত আমদানী আর প্রাচুর্য অন্য কোন নগরীতে নাই বল্লেই চলে। ফুসতাত নগরীর মৃৎশিল্প ছিল চমৎকার। কারুকার্য হস্তলিপি এবং মনোরম চিত্রায়ন ও অদ্ভুত রংতুলির ব্যবহার যে কোন রুচিশীল মানুষকে অবাক করে দিত। বাজারের দ্রব্যসামগ্রী একদরে বিক্রি হোত। কেউ যদি ক্রেতাকে প্রতারিত করত তবে প্রতারক বিক্রেতাকে উঠের পিঠে চড়িয়ে ঘন্টি বাজিয়ে নগরের সড়ক প্রদক্ষিণ করানো হোত। তার নিজের মুখেই অপরাধের স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করান হোত। সকল ব্যবসায়ী ভাড়া করা গাধায় চড়ত। নগরে এমন ভাড়ার জন্য ৫০০০ গাধা মৌজুদ থাকত। কেবল সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ত।

মিশর ছিল শান্ত, সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ। অলঙ্কারের বিপনী বিতান আর মুদ্রা বিনিময় দোকানগুলির উপর কেবল একটা চাদর বিছিয়ে নিরাপদে দোকানী ফেলে রেখে যেতে পারত। সরকার আর খলিফার প্রতি জনগণের ছিল অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি। ৩০০ পারস্যবাসী সহচর সশস্ত্র অবস্থায় পদাতিক বাহিনীরূপে খলিফার সঙ্গে চলতো। প্রধান কাযী, বরেণ্য ধর্মশাস্ত্রবিদ, ২০০০০ কিতামা বার্বার ১০,০০০ বাতিলীস ১৫,০০০ হিজাজী ৩০,০০০ সাদা কালো চাকর, ১০,০০০ প্রাসাদসেবী ৩০,০০০ কাফ্রী তলোয়ারধারী খলিফার অধীনে সর্বদা থাকত।

খলিফার প্রাসাদে সম্মানিত মেহমান হিসাবে যাতায়াত করতেন মাগরিব, ইয়েমেন, রুম, স্যালভানিয়া, জর্জিয়া, নুবিয়া, আবিসিনিয়া এবং ভারত ও তাতার দেশের রাজন্যবর্গ ও রাজপুত্ররা। জ্ঞানীজন মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে খলিফার সঙ্গে থাকতেন, কোন সময় প্রাসাদে, কখনও ভ্রমণে, আবার কখনও নীলনদের নৌবিহারে।

মুয়াইদ ফী দীন আশ শীরাজী ঃ পারস্যের দাইলাম পার্বত্য এলাকার শিয়া পরিবারে মুয়াইদের পূর্বপুরুষদের অধিবাস। ৩৮৭ হিজরীতে তাঁর জন্ম সিরাজে। পারস্য বুয়াইদদের শাসনে মুয়াইদ ও তাঁর পিতা ইসমাইলীয়া মতবাদ প্রচারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। আব্বাসীয়দের দ্বারা তাড়িত হয়ে ৪৩৭ হিজরীতে পারস্য থেকে বেরিয়ে নানা দেশ ঘুরে ৪৩৯ হিজরীতে কায়রোতে আসেন। এ সময় ইহুদী বণিক আবু সাদ ও রানীমাতা দ্বারা মিশর শাসিত হচ্ছিল। মুয়াইদ তাঁর বিবরণীতে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কথা লিখেছেন। ইয়াজুরীর শাসন আমলে মুয়াইদ সচিবের দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে সামরিক অভিযানে আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন।

৪৪৯ হিজরীতে নাটকীয়ভাবে আব্বাসীয় ও ফাতেমীয়দের মধ্যে এক সামরিক সংঘর্ষ বাধে। আল মুয়াইদ ফাতেমীয়দের পক্ষে সিরিয়া ও ইরাকের রাজন্যবর্গ সহ আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে বিরাট বাহিনী নিয়ে বাগদাদ অভিযান করেন। এ সময়ে আব্বাসীয়দের তদারকী করছিল সেলজুকরা। তারা বেশ শক্তি সঞ্চয় করে ফাতিমীয় রাজধানী কায়রো সীমান্ত পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। মিশর আক্রমণের জন্য তারা প্রস্তুতি নেয়। আল মুয়াইদের উদ্দেশ্য সেলজুকদের শক্তি খর্ব করা। মুয়াইদ এক বিরাট সেনাবাহিনী আল বাসা সিরির নেতৃত্বে বাগদাদে প্রেরণ করেন। এই সময় সেলজুক সুলতান তুঘরিল বেগ বাগদাদে অনুপস্থিত থাকায় ফাতেমীয় সেনারা সহজে বাগদাদ অধিকার করে ৪৬০ হিজরীতে। আব্বাসীয় খলিফা আল কাইয়ুমকে বন্দী করা

www.waytojannah.com

হয় এবং প্রায় এক বছর ধরে ফাতেমীয় খলিফার নামে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে খুৎবা পঠিত হয়। এই সময়টিই ছিল ফাতেমীয় খিলাফতের জন্য সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আরব আজম সর্বত্রই ফাতেমীয় খলিফার প্রাধান্য কায়েম হয়। আব্বাসীয় খলিফার পাগড়ী লাঠি আর রাজকীয় মূল্যবান পোশাক সবই কায়রোতে এনে জমা করা হয়।

অবশ্য এই দুঃসংবাদ পেয়েই তুঘরিল বেগ বাগদাদে উপস্থিত হলেন এবং বিরাট সেনাদল নিয়ে আল বাসাসিরীর বাহিনীকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন এবং বন্দী খলিফাকে মুক্ত করে পুনরায় খিলাফতে বসালেন। বাসাসিরীকে বন্দী করে হত্যা করেন এবং প্রাচ্যে আব্বাসীয় খলিফার প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

আল মুয়াইদকে ৪৫০ হিজরীতে দাওয়া বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। ৪৫৩ সালে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে তাঁকে এক বছরের জন্য সিরিয়াতে নির্বাসিত করা হয়। অবশ্য ৪৫৪ হিজরীতে তিনি আবার স্বপদে অধিষ্ঠিত হন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে এই সময়টি ছিল মিশরের জন্য খুবই দুর্যোগপূর্ণ। সমগ্র উত্তর আফ্রিকা মিশরের হাতছাড়া। কায়রোতে উজির বদলের পালা দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। ৪০ জন উজির আর ৪২ জন কাযীর সল্প সময়ের মধ্যে ক্ষমতায় আগমন ও প্রস্থান ঘটে। কেবল কেন্দ্রীয় দাওয়া বিভাগটিই আল মুয়াইদের উপর দীর্ঘদিন যাবত ন্যস্ত থাকে। আল মুয়াইদ ৪৭৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। খলিফা তাঁর জানাজায় শরীক হন এবং তাঁর কর্মময় জীবন সাফল্যের উপর এক শোকগাঁথা রচনা করেন। মুয়াইদ তাঁর সময়ে দুজন জ্ঞানীজনের সংস্পর্শে আসেন-একজন পণ্ডিত নাসির-ই-খসরু, অন্যজন কবি আবুল আলা আল মাররী। নাসির-ই-খসরু তাঁর রচনাবলীতে আল মুয়াইদের কথা ও তাঁর প্রভাব অপকটে উল্লেখ করেছেন। কবি এবং দার্শনিক আবুল আলা আল মাররী তাঁর কাব্যে আর দর্শনে শিয়া-সুন্নীদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং নানা ভাবে সমালোচনা করে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন, যা সুন্নী ও শিয়াদের জন্য বেশ বিব্রতকর ছিল। আল মুয়াইদ আবুল আলার সাথে বিতর্কিত বিষয়ে আলোচনায় মিলিত হতেন এবং ভাবের আদান-প্রদান করতেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে চিন্তার অমিল হলেও একে অন্যের প্রতি যথেষ্ট সম্মান, শ্রদ্ধা ও আস্থা রাখতেন।

আল মুয়াইদ অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তাঁর নিজের জীবনী বা আত্মচরিত লিখেছেন বহু ঘটনার বিবরণ দিয়ে। আব্বাসীয় ও ফাতিমীয় খিলাফতের বিবরণী ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিবরণী পরবর্তীকালে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এ ছাড়া তাঁর এক হাজার বক্তৃতামালা সংকলন আল মাজালিস খুবই মূল্যবান গ্রন্থ। তাঁর কাব্যগ্রন্থ দিউয়ান ও শিয়ামতবাদপুষ্ট ভক্তিমূলক চরণে সমৃদ্ধ। ফাতিমীয় আন্দোলনে আল মুয়াইদের লেখা সর্বশেষ রচনা সমৃদ্ধ মূল্যবান সম্পদরূপে পরিগণিত।

আল মুসতানসিরের সুদীর্ঘ ৬০ বছর রাজত্বকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে। তাঁর সময়ে কারমাতীয়দের প্রসঙ্গ আলোচনার দাবী রাখে।

কারমাতীয়া আন্দোলন : পারস্য উপসাগরে বাহরাইনের আল হাজার বা আল হামায় কারমাতীয়রা রাজধানী স্থাপন করে তাদের প্রচারকার্য বিভিন্ন ভাবে অব্যাহত রাখে।

এই সময় কারমাতীয়রা বিত্তবান লোকদের নিকট হতে জোরপূর্বক সম্পদ লুন্ঠন করে বিত্তহীনদের মধ্যে বিতরণের রাজনীতি করতে থাকে। কোন সময় গোপনে তারা

www.waytojannah.com

প্রাণসংহার করে বিত্ত হস্তগত করার কাজটিও করতে থাকে। তারা সমাজতান্ত্রিক কমিউনিজমের ন্যায় সাম্যবাদী দর্শন প্রচার করতে বিশেষভাবে উৎসাহ দেখায়। নাসিরী খসরু তাঁর সফর নামায় এ সমস্ত কথা উল্লেখ করেছেন। সেলজুকরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলি দখল করে এবং মঙ্গোলরা তাদের সংগঠনকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

হাসান বিন সাববাহ ঃ ইয়েমেনের আযর বংশোদ্ভূত দ্বাদশ ইমামতে বিশ্বাসী। রাই নগরের এক পরিবারে ৪৩০ থেকে ৪৪০ হিজরীর মধ্যে হাসান বিন সাববাহ জন্মগ্রহণ করেন। সমসাময়িক ওমর খৈয়ামের সাথে জ্ঞান বিতরণ ও দর্শনে তার মতবিনিময় ঘটে। সেই সময় পারস্যে ফাতেমীয় প্রচারক প্রধান আব্দুল মালিক হাসান বিন সাব্বাহকে তাঁর সংগঠনে নিয়ে আসেন। তিনি হাসান বিন সাববাহকে মিশর সফরে অনুপ্রাণীত করেন এবং আল মুয়াইদের সাথে সাক্ষাৎ করে মিশরে ফাতেমীয় খিলাফতকে মজবুত করার কাজে সাহায্যের উপদেশ দেন। ৪৭১ সালে হাসান মিশরে পৌছালে তখন তিনি বদর আল জামালীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। কেননা সেই সময় আল মুয়াইদ মারা গেছেন। বদর আল জামালীর সাথে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন বিষয়ে হাসানের ঐক্য–মত হয়নি। ব্যর্থ হয়ে হাসান মিশর থেকে প্রত্যাবর্তন করে আলামুত পর্বতের দুর্ভেদ্য অঞ্চলে তাঁর মিশনের কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে অত্যন্ত কঠিন পদ্ধতি অবলম্বনে স্তরভিত্তিক কর্মী সাথী ও সদস্য বাছাই করে একটি সংগঠন তৈরী করেন। সহিংস ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। চতুর্দিকে সেলজুক রাজ্য এবং তাদের বৈরী হওয়ায় গোপন হত্যায় সদস্যদেরকে উৎসাহিত করেন। আব্বাসীয় খিলাফতের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে গুপ্ত হত্যার নীলনকসা তৈরী করে। তাদেরই হাতে অত্যন্ত যশস্বী উজির নিযামুল মুলকের প্রাণ দিতে হয়। সন্ত্রাস ও গুপ্তহত্যার জন্য তাদেরকে গুপ্ত ঘাতক দল হিসাবে অভিহিত করা হয়।

হাসান বিন সাব্বাহ তাঁর অনুচরদিগকে মাদক দ্রব্য সেবন করাতেন এবং অচৈতন্য হলে তাদেরকে কৃত্রিম জান্নাতে গমনের অলীক কাহিনী শ্রবণ করাতেন। তাদেরকে বোঝাতেন যে তারা যদি তাদের শত্রুদের হত্যা করে এবং হত্যা কর্মে যদি নিহত হয় তবে চিরস্থায়ী জান্নাতে তারা বসবাস করবে। মাদক দ্রব্য হাশিশ সেবন করে মাতাল অবস্থায় তারা তাদের চিহ্নিত প্রতিপক্ষকে হত্যা করত। রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যা এমনভাবেই জন্ম নেয়। মঙ্গোলদের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত আলামুত পর্বতে গুপ্ত ঘাতক দলের কর্যক্রম অব্যাহত ছিল। বাগদাদ ধ্বংসের পূর্বে হালাকু খান তাদের আস্তানায় হানা দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। হাসান বিন সাববাহ সুদীর্ঘকাল যাবৎ আলমুতে অবস্থান করে ইসমাইলীয় মতবাদ সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁকে শাইখ আল জিবাল বা old man of the mountain বা পর্বতের বৃদ্ধ লোকটি বলে অভিহিত করা হয়। তিনি খলিফা মুসতানসিরের জ্যেষ্ঠ্যপুত্র নিযারকে পরবর্তী খলিফারূপে স্বীকৃতি দেন, যদিও তাঁকে উত্তরাধিকারী করা হয়নি। যা হোক গুপ্ত ঘাতক দলটির অনেক সাহিত্য আলামুতে ছিল। কিছু কিছু গ্রন্থের কথা আতা মালিক জুয়াইনী উল্লেখ করেছেন।

মুসলিম ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সময়ের রাজত্বকারী খলিফা মুসতানসির ৪৮৭ হিজরী মুতাবেক ১০৯৪ সালে ইনতিকাল করেন। উজির আফজাল তাঁর মৃত্যুর পরই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আল মুসতালীকে খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেন।

দশম অধ্যায়

৪৮৭–৪৯৫হিঃ
১০৯৪–১১০১খ্রীঃ

আবুল কাশিম আহমদ আল মুসতালী

খলিফা মুসতানসির মৃত্যুবরণ করলে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আবুল কাশিম আহমদ আল মুসতালীকে উজির আফজাল আল জুয়ুস খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেন। এ সময় মুসতালীর বয়স ১৮ বছর। উজির আল মুসতালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিযার ও অন্য দুজন আব্দুল্লাহ ও ইসমাইলকে সংবাদ প্রেরণ করেন দ্রুত প্রাসাদে উপস্থিত হবার জন্য। যখন তারা উপস্থিত হলেন তখন নতুন খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য বলা হলে জ্যেষ্ঠ পুত্র নিযার ক্রোধে চিৎকার করে বলেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট আনুগত্য প্রদর্শন অপেক্ষা আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা সহজ, অধিকন্তু পিতা কর্তৃক আমাকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের দলিল আমার নিকট রয়েছে। অতএব ওটা আমাকে আনতে হবে। এই বলে তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যান। তারপর তিনি কায়রো ছেড়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিত হন। এ সময় ইসমাইলীয়দের বিরাট একটা সংখ্যা নিযারকে উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনয়ন দানের পক্ষে ছিল। ফলে বেশ কিছু সমর্থক নিযার আলেকজান্দ্রিয়ায় পেয়ে যান। ভ্রাতা আব্দুল্লাহও তাঁর সাথে যোগ দেন এবং উজির আফজালের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ইবনে মাসালও তাঁকে সমর্থন করেন। তিনি নিযার আল মুসতাফা দীনিল্লাহ উপাধি নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় নিজকে খলিফা ঘোষণা করেন এবং যথারীতি স্থানীয়দের নিকট হতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার গর্ভনরকে উজির করার আশ্বাসে তাঁকেও নিজ পক্ষে আনেন। এই তুর্কী গভর্ণর নাসিরুদ্দৌলাও নিযারকে সাহায্য করতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে নিযারের পক্ষে বেশ জনসমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শক্তি সঞ্চয় করে সিংহাসন দখলের অভিপ্রায়ে নিযার সৈন্যবহিনী নিয়ে কায়রো আক্রমণ করেন। উজির আফজাল এই আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে প্রথম বারে পিছু হটেন। সামরিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে নিযার উত্তর কায়রোতে কিছু ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকেন। এবার উজির আফজাল বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিযারের বাহিনীকে ধাওয়া করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করেন।

অবরোধকালে ইবনে মাসাল যিনি নিযারের শক্তি সাহসের উৎস, তিনি এক স্বপ্ন দেখেন যে, উজির আফজাল পদব্রজে যাচ্ছেন আর তিনি অশ্বারোহণে চলেছেন। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারদের নিকট এর হেতু জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানতে পারেন যে যিনি জমিনের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন মুলতঃ জমিনের অধিকার তাঁর উপর চলে যাবে অর্থাৎ বিজয় উজির আফজালের অবধারিত। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ইবনে মাসাল নিযারের পক্ষ ছেড়ে উজিরের পক্ষে যোগদান করেন। ফলে নিযার অত্যন্ত বিপদে পড়েন এবং তাঁর জয়ের

www.waytojannah.com

কোন আশা আর রইল না। তখন তিনি উজিরের নিকট প্রাণভিক্ষার শর্তে নগরের আত্মসমর্পণ করবেন এই মর্মে প্রস্তাব প্রেরণ করেন। উজির সম্মত হলেন এবং নগরদ্বার উন্মুক্ত হোল। সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল। নিযার ও আব্দুল্লাহকে বন্দী করে বিজয়ী বেশে উজির আফজাল কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর নিযারের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা আর জানা যায়নি। কেউ বলেন তাঁকে হত্যা করা হয় আবার কেউ বলেন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমৃত্যু কারাবাসে রেখে দেওয়া হয়। যা হোক, নিযারের ভাগ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে এমনিভাবেই। মুহাম্মদ নামে নিযারের পুত্র দাবীদার এক ব্যক্তি ইয়েমেনে আবির্ভূত হলে তাকেও কায়রোতে ধরে আনা হয় এবং ৫২৩ হিজরীতে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। তবে অনেকের মতে সে আসলে ভণ্ড বা ছদ্মবেশী ছিল, সত্যিকার নিযারের পুত্র নয়।

নিযারের পতনের পর খলিফা আল মুসতালির আর কোন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রইল না। শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে শাসনকার্য চালানোর জন্য আর কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তবে ফাতিমীয় মতবাদ আবার স্পষ্টভবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। নিযারের পক্ষ অবলম্বনকারীরা নিযারীয় দলের জন্ম দিল এবং তারা ফাতেমীয় খিলাফতকে বিরোধিতা করতে শুরু করল। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন হাসান বিন সাববাহ। তিনি নিযারীয় মতবাদের সমর্থক ও প্রচারকরূপেই এশিয়াতে ফাতিমীয় কায়রোর ইম-ামতকে বিরোধিতা শুরু করেন। ফাতিমীয় মতবাদকে হাসান বিন সাববাহ নিজ দর্শনের আঙ্গিকে ঢেলে সাজান। হেলেনিক দর্শন ও সর্বেশ্বরবাদী মতবাদের ন্যায় নিযারীয় মতবাদকে বিজ্ঞান ও দর্শনভিত্তিকরূপে উপস্থাপন করেন। এ দলের সাথী সদস্যাদের শ্রেণীবিন্যাস করে দলীয় কাঠামোকে মজবুত করার পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেন তিনি। হাসান বিন সাববাহর গুপ্ত ঘাতক দলই নাযিরীয় মতবাদপুষ্ট এবং ইসমাইলীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ। দলীয় সদস্য বাছাই বা তৈরীর যে শ্রেণীবিন্যাস করেন তার রূপটি হলঃ-

সর্বোচ্চ পদে থাকবেন প্রধান দায়ী, যিনি ইমামকেই জমিনের সর্বশেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করবেন। মুসতানসিরের মৃত্যুর পর নিযারই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং ইমাম। প্রধান দায়ী হবেন নিযারের বংশের। তবে এ বিষয়টি আবার পরবর্তীকালে আব্দুল্লাহ বিন মায়মুনের ন্যায় হয়ে যায়। প্রধান দায়ীকে বলা হত শাইখ আল জিবাল বা পর্বতের প্রধান ব্যক্তি। কেননা হাসান বিন সাববাহর প্রধান দফতর ছিল আলামুত পর্বতে। প্রধান দায়ীর অধীনে প্রবীণ দায়ীগণ থাকতেন, যাদের বলা হোত দায়ী আল কবির। প্রত্যেকের অধীনে এক-একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল থাকত। এই দায়ীদের অধীনস্থ থাকত রফিক বা সাথী এবং লাছিক বা সঙ্গী। আর সাধারণ সমর্থক শ্রেণীর লোককে বলা হোত ফিদাই। এই ফিদাইদিগকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ দেয়া হোত। নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস এবং অনড় আস্থা রাখতে হোত। কঠোর শ্রম সাধনা ও শৃঙ্খলা বিধানের মাধ্যমে ফিদাইদিগকে গড়ে তোলা হোত। তাদের ছদ্মবেশে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দিয়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জন্য নিয়োগ করা হোত। চাকর, বণিক, দরবেশ, খৃষ্টান পাদরী প্রভৃতি পেশার বেশ ধরে তারা লক্ষ্যপানে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অপেক্ষা করত। তারপর নির্দিষ্ট ব্যক্তি নাগালের মধ্যে এলেই সুযোগ বুঝে হত্যা করে গা ঢাকা

www.waytojannah.com

দিত। এসব কর্ম সম্পাদনে নিজের প্রাণের ঝুঁকি ছিল তথাপিও তারা প্রাণের বিনিময়ে হত্যাকর্ম থেকে পিছপা হোত না। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তারা হত্যা করেছে এমনি গুপ্ত ভাবে এবং সর্বত্র একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সমাজে দারুণ নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। এই গুপ্ত ঘাতক দলের হাতে প্রাণ দিতে হয় প্রসিদ্ধ উজির নিযাম উল মুলককে ৪৮৫ হিজরীতে। বারকিয়াকুক মাতার উজির আব্দুর রহমান আস সামাইরামীকে প্রাণ হারাতে হয় ৪৯১ হিজরীতে এবং ইস্পাহানের আমীর আনরু বালকার প্রাণহানি ঘটে ৪৯৪ হিজরীতে। গুপ্তঘাতক দল যেমন খলিফা মুসতালীর সময়ে ইসমাইলীয় খলিফা বিরোধী শক্তিরূপে সমাজে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করে তেমনিভাবে সেলুজক তুর্কীরা ইস-মাইলীদের ধ্বংসের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে থাকে। আবার নতুন এক বিপদ এসে উপস্থিত হয়। সেটা হোল খ্রীষ্টান ধর্মান্ধদের মুসলিম নিধন অভিযান। প্রাচ্য দেশের খ্রীষ্টানদের হৃতরাজ্য পুনর্দখলের জন্য ধর্মীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার চেষ্টাই তাদের ভাষায় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে অভিহিত।

৪৯০ হিজরীতে আল মুসতালীর রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে ক্রুসেডরা প্রথমে সিরিয়া আক্রমণ করে। এই প্রথম ক্রুসেড এমন এক সময় শুরু হয় যখন নিযার আর মুসতালির মধ্যে উত্তরাধিকার সংঘর্ষ চলছে আর অন্যদিকে সেলজুকরা আব্বাসীয় শাসনের শিখরে নিরঙ্কুশ প্রভাব বিস্তারে তৎপর। ফাতেমীয়রা প্রথমে ভাবল ক্রুসেডরা প্রথমে সিরিয়া আক্রমণ করে সেলজুকদের বিরুদ্ধে তাদেরই সহায়ক শক্তি হবে। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাদের এই ভুল তিরোহিত হোল। তারা বুঝতে পারল যে সিরিয়া ও জেরুজালেমসহ সমগ্র এলাকায় তাদের প্রভুত্ব ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম নিধন ও উচ্ছেদ করাই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৪৯০ হিজরীতে বলডিনের নেতৃত্বে ক্রুসেডরা সিরিয়া আক্রমণ করে এডেসা নগর অধিকার করে। তারপর এন্টিয়ক অবরোধ করে ৪৯১ হিজরীর ১৬ই রজব। এ শহরও দখল করে। প্রথমতঃ ফাতেমীয় উজির আফজাল এ আক্রমণকে স্বাগত জানায় এই ভেবে যে, সেলজুকদের বিরুদ্ধেই এটা হয়েছে। অতঃপর ফ্রাঙ্ক ও ফাতেমীয়রা ভাগাভাগি করে পশ্চিম এশিয়া শাসন করবে। সেখানে সেলজুকদের কোন প্রভাব থাকবে না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আফজাল এক সেনাবাহিনী জেরুজালেমে প্রেরণ করেন সেলজুকদের বিরুদ্ধে। সেলজুক আমির আরতুকের পুত্র সোকমানের নিকট হতে জেরুজালেম কেড়ে নিয়ে আফজাল ফ্রাঙ্কদের নিকট মৈত্রী চুক্তির জন্য দূত প্রেরণ করেন। ফ্রাঙ্করা অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে মৈত্রী প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এবং মুসলমানদের সাথে কোন বন্ধুত্ব নেই বলে দূতকে ফিরিয়ে দেয়। এর পরপরই বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে জেরুজালেম অধিকারের জন্য তারা অগ্রসর হয়। ৪৯২ সালের শাবান মাসে তারা জেরুজালেমে ঢুকে পড়ে মসজিদ লুট করে মুসলমানদের শিয়া সুন্নী নির্বিশেষে হত্যা করে। জেরুজালেম দখল করে ফাতেমীয় গভর্নরকে বিতাড়িত করে গডফ্রেকে জেরুজালেমের রাজা বলে ঘোষণা করে। খ্রীষ্টান নিয়ম কানুন জেরুজালেমে জারি করা হয়। ব্যাপকভাবে মুসলিম হত্যা নির্যাতন ও উচ্ছেদ চলে। হযরত ওমর (রাঃ) জেরুজালেম দখল করে সেখানে শান্তি নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়ে মানবতার পতাকা উড্ডীন করেন। প্রায় চারশত বছর পর মুসলমানদের নিকট হতে জেরুজালেমের

www.waytojannah.com

অধিকার কেড়ে নিয়ে খ্রীষ্টানেরা সেখানে নরহত্যাসহ বর্বর ও নৃশংস আচরণ করে জগৎবাসীকে অবাক করে দেয়। এটাই তাদের গীর্জার আচরণ। ক্রুশের নাকি শিক্ষা!
৪৯৩ হিজরীতে প্যালেষ্টাইনের ফাতিমীয় শহর আসকালন আক্রমণ করে ক্রুসেডরা। এই আক্রমণের পূর্বে সন্ধির জন্য ফাতিমীয়রা প্রস্তাব দিলে তাও অগ্রাহ্য করা হয়। যুদ্ধ শুরু হলে হত্যা লুণ্ঠন ও বর্বরতার করুণ কাহিনী সৃষ্টি করে। আফজালকে পরাজিত করে আসকালন তারা দখল করে এবং মিতার আক্রমণের জন্য অগ্রসর হতে থাকে। ৪৯৫ হিজরীতে তারা জাফফা দখল করে। ঠিক মিশর আক্রমণের প্রস্তুতির সময়ে আল মুসতালীর মৃত্যু হয়।
খলিফা মুসতালীর রাজত্বে ফাতেমীয় শাসনের সীমানা সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ক্রুসেডরা ফাতেমীয় রাজ্য গ্রাস করতে শুরু করে। খলিফার নিজস্ব কোন ভূমিকা রাজ্য শাসনে ছিল না। উজির আফজাল আল জামালীই ক্ষমতার সর্বেসর্বারূপে ছিলেন। খলিফার মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর পুত্র আমিরকে পরবর্তী খলিফা ঘোষণা করা হয়।

www.waytojannah.com

একাদশ অধ্যায় . ৪৯৫–৫২৪হিঃ / ১১০১–১১৩১খ্রীঃ

আবু আলী আল মনসুর আল আমীর–বি–আহকামিল্লাহ

খিলাফতের দায়িত্বে আট বছর থাকার পর যৌবন বয়সেই খলিফা আল মুসতালীর জীবনাবসান ঘটে। তাঁরই ৫ বছর বয়স্ক পুত্রকে ফাতিমীয় নীতি মোতাবেক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করান হয়। দক্ষ অভিজ্ঞ উজির আফজালই শাসনের মুল কেন্দ্রবিন্দুরূপে বহাল রইলেন। শিশুকে নামে খলিফারূপে আনুগত্য প্রদর্শন করে বিলাসবহুল অলস জীবনের উপকরণ দিয়ে হেরেমেই রেখে দেওয়া হয়। খলিফার হাত বদল হলেও আফজালের দৃষ্টি তখন ক্রুসেডদের দিকে। কারণ তখন তারা প্যালেষ্টাইনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং মিশর আক্রমণে উদ্যত। ৪৮৭ হিজরীতে ফ্রাঙ্করা আক্কা অধিকার করে। এই সময়ে ফাতেমীয় দরবারে ফ্রাংক আক্রমণের ভীতিটা প্রবল হয়ে ওঠে। ৪৯৭ হিজরীতে উজির আফজাল এক বিশাল সেনাবাহিনী স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে প্যালেষ্টাইন অভিযানে প্রেরণ করেন। আফজাল–পুত্র বীর বিক্রমে ফ্রাঙ্ক বাহিনীকে আক্রমণ করে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে প্যালেষ্টাইন হতে পলায়ন করতে বাধ্য করেন। গডফ্রেয়ের উত্তরসুরী বলডিন আত্মগোপন করতে বাধ্য হন।

বিজয়ী মিশরীয়বাহিনী রামলা অধিকার করে পরাজিতদের অনেককে হত্যা করে এবং প্রায় তিনশত নাইটকে বন্দী করে মিশরে প্রেরণ করে। এরপর আবার উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়, কিন্তু কোন সুফল কারো পক্ষে হয়নি। আসকালন ও জাফফার মধ্যে আবারও খ্রীষ্টান–মুসলিম সংঘর্ষ হয়, তবে ইতিবাচক কোন ফলাফল হয়নি।

৫০২ হিজরীতে ফ্রাঙ্করা ফাতেমীয়দের বিরুদ্ধে বড় রকমের বিজয় লাভ করে। তারা ত্রিপোলী অধিকার করে। নগরে প্রবেশ করে তারা হত্যা লুন্ঠন এবং চরম অমানবিক অত্যাচার করে। দাস হিসাবে বহু মুসলমানকে বিক্রয় করে। যাদের বন্দী করে তাদেরকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে। কলেজ ও গ্রন্থাগার সমূহে ধ্বংস করে। তাদের বর্বরতা ছিল সীমাহীন।

৫০৩ হিজরীতে তারা বৈরুত এবং সিডন অধিকার করে। প্রায় ছয় বছর যাবৎ এইভাবে ফ্রাঙ্করা ফাতেমীয়দের নিকট হতে মুসলিম জনপদগুলি একে একে গ্রাস করতে থাকে। ৫১১ হিজরীতে বলডিন ফারামা দখল করে মসজিদ নগর ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। ফ্রাঙ্করা তিন্নিসে অভিযান চালায়। এরপর বলডিন অসুস্থ হয়ে আল আরিকে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে জেরুজালেমে পুনরুত্থান গীর্জায় সমাধিস্থ করা হয়। রামলা, আসকালন ও তাইয়ার ব্যতীত প্যালেষ্টাইন ফ্রাঙ্কদের অধিকারে চলে যায়। উজির আফজাল মিশরকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে শাসন করছিলেন। ফলে কায়রোতে

www.waytojannah.com

ফ্রাঙ্কদের অভিযান সম্ভব হয়নি। একাদিকক্রমে বহু বছর ধরে আফজাল শাহানশাহ ক্ষমতায় থাকার ফলে উচ্চাভিলাষীদের বিরোধীতা প্রকটভাবে শুরু হয়। তাছাড়া খলিফাও যেন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের গুটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে উজিরের বিরুদ্ধে মনোভাব তৈরী করে ফেলেন। ৫১৫ হিজরীতে খলিফা সরাসরি উজিরের প্রভাব থেকে নিজকে মুক্ত করার জন্য উজিরের প্রাণনাশের চক্রান্ত করেন। এই সময়ে দাওয়া বিভাগের কার্যক্রমের স্বাধীনতা সকল কর্মের উপরে রাখার জন্য দাওয়া প্রধান আবুল বারাকাত খলিফার নির্দেশে উজির আফজালের নিকট প্রস্তাব করেন। উজির শুধু এ প্রস্তাব নাকচ করেন তাই নয়, উপরন্তু দাওয়ার প্রধান দফতর দারুল ইলম বন্ধ করে দেন। খলিফা, প্রধান দায়ী, খলিফার চাচা আব্দুল মজিদ, সবাই উজিরের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং উজিরের ঘনিষ্ঠ সহচর ইবনে আল বাতাহীর সহযোগিতায় ৫১৫ হিজরীতে উজির আফজালকে হত্যা করা হয়। উজিরের প্রশাসন মিশরে ফাতিমীয়দের জন্য ছিল শান্তি শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাদের মিশর আক্রমণের প্রস্তুতিকে নস্যাৎ করেন। অভ্যন্তরীণ বিষয়ে, বিশেষ ভাবে জমির উন্নতির জন্য বহু খাল খনন করে সেচ ব্যবস্থা করেন। কৃষি কর বা খাজনার পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস সাধন করেন। মুকাত্তাম পর্বতে একটি মন্দির স্থাপন করেন। জামিআ আর রশিদ নামে মনোরম মসজিদ নির্মাণ সমাপ্ত করেন। মসজিদ জামিআ আল ফিল নামে আর একটি সমজিদ নির্মাণ শুরু করেন।

মূলতঃ অর্ধ শতাব্দী ধরে আর্মেনিয়ান উজির পরিবার মিশরের ফাতেমীয় বংশের জন্য এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, বাণিজ্য ও জনকল্যাণকর কাজ তারা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে করেন। দেশের জন্য শান্তি শৃঙ্খলা এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়, এবং মিশর শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা পায়।

খলিফা আমীর আফজালের মৃত্যুর পর মুহাম্মদ বিন আবি সুজা বিন আল বাতাহী আল মামুনকে উজির নিয়োগ করেন। ইনি যোগ্য অর্থনীতিবিদ ছিলেন। তবে অত্যন্ত কর্কশ ও নিষ্ঠুর ছিলেন। শিল্প সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল কিন্তু নির্দয়তার জন্য তিনি পূর্ব উজির অপেক্ষা খলিফাকে আরো বেশী কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখেন।

যেহেতু তিনি অত্যন্ত কৌশলী বুদ্ধিমান ও পন্ডিত ছিলেন সেহেতু তাঁর কার্যক্রম বহুমুখী ছিল। রাজ্যে শুমারী শুরু করেন এবং গুপ্তচর বাহিনীতে মহিলাদের নিযুক্ত করেন। তারিখ আল মামুন নামে একখানি ফাতিমীয় ইতিহাস রচনা করেন। তাঁর সময় রাজনীতি ও বিজ্ঞানের উপর অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। মিশরের উজিরদের জীবন চরিত্র বিষয়ক 'কিতাব আল ইশারা' রচনা করেন ইবনে আস সাইরাফী। এটা মিশরের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা মূল্যবান দলিলস্বরূপ। আল বাতাহী জামিআ ফিল মসজিদের নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন এবং জামিআ আল আকরাম নামক ধূসর বর্ণের মসজিদ নির্মাণ করেন।

উজির আফজাল কর্তৃক বন্ধকৃত দারুল ইলম আল বাতাহী খুলে দেন। এই দফতরটি আবারও উজিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ফলে দ্বিতীয় বারের মত এটা আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময়ে খলিফাকে অবহিত করা হয় যে, উজির খলিফাকে

www.waytojannah.com

অপসারণ করে নিযারের মুহাম্মদ নামক পুত্রকে সিংহাসনে বসানোর চক্রান্ত করছেন। বিষয়টি খলিফা অত্যন্ত ত্বরিতে গ্রহণ করেন এবং উজিরকে বন্দী করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। শুধু তাই নয় বন্দী অবস্থায় তিন বছর রাখার পর ৫২১ হিজরীতে তাঁর পাঁচ ভ্রাতা এবং কথিত নিযারের পুত্রসহ সবাইকে হত্যা করা হয়। খলিফা এবার আর কোন উজির নিয়োগ না করেই নিজেই শাসন ক্ষমতা চালাতে থাকেন। একটি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করে দেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আবু নাজাহ বিন খান্নাহ নামক এক খ্রীষ্টান পাদরীকে অর্থ বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে কর আরোপ করেন। তাঁর উচ্চহারে কর আদায়ে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টান আদায়কারীরা জনগণকে দারুণভাবে নির্যাতন করে। বলা হয় যে অতিরিক্ত একলক্ষ দিনার কর রাজকোষে জমা হয়। কিন্তু জনগণ ক্ষিপ্ত হওয়ায় খলিফা তাকে অপসারণ করেন। দিনদিন মিশরের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। জনগণ খলিফাকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করতে থাকে। কার্যত তিনি রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য কিছুই করতে পারেননি। উপরন্তু নিযারীয় ফিদাইরা তার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল এবং অবশেষে তারাই তাকে হত্যা করে। ২৯ বছর ক্ষমতায় থেকে ৩৪ বছর বয়সে ৫২৪ হিজরীতে তিনি নিহত হন।

www.waytojannah.com

দ্বাদশ অধ্যায়

৫২৪—৫৪৪হিঃ
১১৩১—১১৪৯ খ্রীঃ

আবুল মায়মুন আব্দুল হামিদ আল হাফিজ লী দীনিল্লাহ

খলিফা আলআমির নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। তবে তার মৃত্যুর সময় তাঁর এক স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন আর এটাই ধারণা করা হচ্ছিল যে, অল্পকালের মধ্যেই একজন উত্তরাধিকারী পাওয়া যাবে। এই সময়ে মুসতালীর ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদের পুত্র আবুল মায়মুন আব্দুল হামিদ আল হাফিজ লি দীনিল্লাহ অভিভাবকরূপে সকলের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। ঐ একই দিনে উজির আফজালের পুত্র আবু আলী আহমদও উজিররূপে সেনাবাহিনীর আনুগত্য গ্রহণ করেন। অভিভাবক এ মর্মে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন যে, রানীমাতা অবশ্যই পুত্রসন্তান প্রসব করবেন, কেননা এই ফাতিমীয় বংশ পুত্রহীন অবস্থায় উত্তরাধিকারশূন্য হতে পারে না। যেহেতু মৃত ইমামের বিদেহী আত্মা পরবর্তী ইমামের মধ্যে প্রবেশ করে এবং খিলাফত ও ইমামত এইভাবেই চলতে থাকবে। দুর্ভাগ্যক্রমে রাণীমাতার গর্ভে একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইতিমধ্যে আবু আলী আহমদ অভিভাবক হাফিজকে অন্তরীণ রেখে সমস্ত ক্ষমতা নিজহাতে তুলে নেন। নতুন আমির অত্যন্ত সফলতার সাথে রাজ্যশাসন করতে থাকেন। শান্তি, শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মিশরবাসী রাজ্য শাসন অপেক্ষা বৈধ খলিফার সন্ধানে বেশী উদগ্রীব ছিল। তারা খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেননা ইসমাইলীয় দর্শনে ইমামের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন নাজাত বা মুক্তির বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আহমদ নিজেও শিয়া ছিলেন কিন্তু তিনি ইসমাইলীয় নন। দ্বাদশ ইমামী। তাঁর বিশ্বাস ছিল দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ আল মুনতাযর ২৬০ হিজরীতে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। সঠিক সময়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু ফাতিমীয় খিলাফত তো সপ্তম ইমামদের ভিতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ফলে আহমদের বিশ্বাসের প্রতিকূলে ইসমাইলীয় খিলাফত যেখানে খুতবা আর মুদ্রায় সপ্তম ইমামের প্রতিচ্ছবি সেখানে বিরাট মতদ্বৈততা প্রকট হয়ে উঠল। এইভাবে হাফিজ চেষ্টা করতে লাগলেন কিভাবে আহমদের অপসারণ সম্ভব হয়। চক্রান্ত শুরু হোল। অবশেষে আহমদকে হত্যা করে হাফিজ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন। তিনি নিজকে খলিফা ঘোষণা করলেন। সেই সময় তাঁর বয়স ৫৭ বছর। খলিফা হাফিজ আফজাল পালিত এক আরমেনীয় দক্ষ সৈনিককে উজির নিয়োগ করেন। তাঁর নাম ইয়ানীস। ইয়ানীস খুবই কর্মঠ তবে নির্মম ছিলেন। খলিফা তাঁকে বেশী দিন সহ্য করতে পারে নি। বিষপ্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয়। এবার হাফিজ উজির ছাড়াই রাজ্যশাসন করতে থাকেন। তাঁর শাসন সুলাইমানকে খিলাফতের উত্তরসূরী হিসাবে মনোনয়ন দেন কিন্তু কিছুদিন পরে তার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর দ্বিতীয় পুত্র হোসাইনকে মনোনয়ন দেয়া হয় কিন্তু তৃতীয় পুত্র হাসানও খিলাফতের জন্য অন্যতম দাবীদার হয়ে ওঠেন। নিগ্রো সেনাবাহিনীর মধ্যে স্পষ্ট দুদলে

www.waytojannah.com

বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল হোসাইনকে অন্যদল হাসানকে সমর্থন করে সংঘর্ষে লিপ্ত সেনাবাহিনী হাসানকে খলিফা হিসাবে ঘোষণা দেয়, ফলে আর্মেনীয়রা খলিফাকে বাধ্য হয়। আর্মেনীয়রা হোসাইনকে এবং স্থানীয়রা হাসানকে সমর্থন দেয়। হাসানের সমর্থক দুদলেকরে হাসানকে হত্যা করার জন্য। খলিফা অগত্যা তাই করে। হাসান নিহত হলেন। আর্মেনীয়রা বিজয়ী হয়ে হোসাইনের জন্য ক্ষমতাকে বিঘ্নমুক্ত করেন। তারা তাদের পছন্দ মুতাবিক বাহরাম নামক একজন খ্রীষ্টানকে উজির হিসাবে নিয়োগ করে। তাঁকে সাইফুল ইসলাম উপাধি দেয়া সত্ত্বেও শাসন কার্যে দারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দেন। জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, ফলে তাঁকে অপসারিত করা হয়। পরবর্তীকালে বাহরাম এক গীর্জায় তাঁর বাকী জীবন অতিবাহিত করেন।

খলিফা রিজওয়ানকে ৫৩২ হিজরীতে উজির নিয়োগ করে। রিজওয়ান মিশরের ইতিহাসে প্রথমবারের মত মালিক আল আফজাল বা উত্তম রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে কোন উজির রাজা উপাধি গ্রহণ করেননি। তিনিই প্রথম এ ধরণের উপাধি গ্রহণ করলেন। উপরন্তু রিজওয়ান সুন্নী ছিলেন। তিনি শিয়া নিয়ম কানুনের পরিবর্তে সুন্নী কানুন প্রচলন শুরু করলে তাঁকে বন্দী করা হয় এবং ১০ বছর কারাগারে রাখা হয়। ৫৪৩ সালে তিনি কারাগার হতে বেরিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। নিগ্রো সেনারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয় ক্রুসেড ঃ প্রথম ক্রুসেড ফাতিমীয়রা বেশ কয়েকদফায় প্রতিহত করলেও সিরিয়া প্যালেষ্টাইন ও জেরুজালেমে ক্রুসেডরা বেশ কিছু আধিপত্য কায়েম করে। ক্রুসেডের দ্বিতীয় দফা শুরু হয় ৫৪২ হিজরীতে। এ সময়ে নূরুদ্দিন জঙ্গী সিরিয়াতে শক্তিশালী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে ক্রুসেডদিগকে চ্যালেঞ্জ করেন। সিরিয়াতে তারা সুবিধা করতে না পারায় তাদের দৃষ্টি পশ্চিম আফ্রিকায় নিবদ্ধ হয়। দ্বিতীয় ক্রুসেড সম্পর্কে অলিয়ারী সাহেব মন্তব্য করেন Thd Second crusade was necessarily a failure. The only important result of Frankish invasion was the kingdom of Jerusalem which had been the work of the First crusade. P-225.

পশ্চিম আফ্রিকাতে ক্রুসেডদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সিসিলির শাসক ২য় রাজার ৫৩৯ সালে উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করে বারকা, ত্রিপোলী, মাহদীয়া দখল করে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এ সময় ফাতিমীয় সৈন্যরা তাদের গতিরোধ করে। মিশরে এই সময় অভ্যন্তরীণ অবস্থাও ভাল ছিল না। উজির রিজওয়ানের মৃত্যুর পর উসামা বিন মানকিদ নামক এক দক্ষ সৈনিককে উজির নিয়োগ করা হয়। যদিও ক্রুসেডের প্রথম যুদ্ধের সময় তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন কিন্তু মিশরীয় প্রশাসনে তিনি যথেষ্ট দুর্নামের কাজ করেন। তিনি কিতাব আল লাতবির নামে আত্মচরিত রচনা করেন।

মিশরে আবারও গোলযোগ শুরু হয়। আর্মেনীয় সৈনাবাহিনী ও স্থানীয় বাহিনীর মধ্যে। রাস্তাঘাটে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। জনমনে নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করতে থাকে। বৃদ্ধ খলিফা হাফিজ যেন অসহায়ের মত দিন যাপন করতে থাকেন। বৃদ্ধ বয়সে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সদয় প্রজাবৎসল এবং খ্রীষ্টানদের প্রতি খুবই উদার ছিলেন। বিভিন্ন গীর্জায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করে অনেক উপহারও প্রদান করেন। কুড়ি বছর রাজত্ব করে ৫৪৪ হিজরীতে খলিফা হাফিজ মৃত্যুবরণ করেন।

www.waytojannah.com

৫৪৪–৫৪৯হিঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায় ১১৪৯–১১৫৪ খ্রীঃ

আবু মনসুর ইসমাইল আজ জাফির লি, আদাই দীনিল্লাহ

ইসমাইল ৫২৭ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল ১৬ বছর। খলিফা হাফিজের মৃত্যুর পর তারই মনোনয়ন মুতাবিক তিনি সিংহাসনে বসেন। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণ করে রাজকার্যে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে তিনি দাসী উপপত্নী আর আরাম আয়েশ নিয়েই মগ্ন হয়ে পড়েন। গান বাজনায় তার নেশা ছিল প্রবল। তাই শাসন কার্যে তাকে একেবারেই উদাসীন দেখা যায়। তার প্রথম কাজ হোল আমির সাইফুদ্দিন আবুল হাসান আলী আস সালার কে প্রধান উজিরের পদ থেকে অপসারণ করে নাযমুদ্দিন বিন মাসালকে প্রধান উজির নিয়োগ করা। ইবনে সালারকে এক প্রদেশের গভর্নর করে প্রেরণ করলে এ আদেশকে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। বরং তার এ পদচ্যুতির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সশস্ত্র সেনাদাল নিয়ে তৈরী হতে থাকেন। ইবনে মাসাল বারকার নিকট লুকেকর বাসিন্দা ছিলেন এবং তিনি ও তার পিতৃপুরুষ অশ্ব ও ঈগল পাখীর ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন।

যখন ইবনে সালারের সেনাবাহিনী কায়রো অভিমুখে যাত্রার সংবাদ রাজধানীতে পৌছাল তখন খলিফা রাজ্যের সকল আমিরদের এক সম্মেলনের ব্যবস্থা করে পরামর্শ চাইলেন কিভাবে সালারকে মুকাবেলা করা যায়। সকলেই ইবনে মাসালের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে খলিফার নিয়োগকে সমর্থন করলেন। কিন্তু এক বৃদ্ধ আমির এ পরামর্শকে সমর্থন করেননি বরং ইবনে সালারের শক্তির ব্যাপারে সকলকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করেন। কার্যতঃ এ ব্যাপারে বাস্তব সিদ্ধান্ত ব্যতীত সভা সমাপ্ত হয়।

এদিকে ইবনে সালার সেনাসংগ্রহ করে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে দ্রুত গতিতে কায়রোর অভিমুখে নীলনদ তীর ধরে অগ্রসর হন। কায়রোতে তিনি কার্যতঃ বিনা বাধায় প্রবেশ করে প্রধান উজিরের বাসভবনে প্রবেশ করে দেখেন সেখানে কেউ নেই। ইবনে সালারের আগমনের সংবাদে ইবনে মাসাল বাসবভন ত্যাগ করে কায়রো থেকে পলায়ন করেন। ইবনে সালার নিজ অবস্থা সুদৃঢ় করে তিনি ইবনে মাসালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। দাইলামে উভয় পক্ষের যুদ্ধ সংঘটিত হলে ইবনে মাসাল পরাজিত ও নিহত হন। ফলে ইবনে সালারের আর কোন প্রতি দ্বন্দ্বী রইল না। যুবক খলিফা যদিও ইবনে সালারকে পছন্দ করতেন না তথাপিও বাধ্য হয়ে তাকে প্রধান উজির রূপে স্বীকৃতি দেন। তবে গোপনে উজিরকে সরিয়ে দিবার ষড়যন্ত্র করতে থাকেন।

ইবনে সালার ছিলেন নিষ্ঠাবান সুন্নী এবং শাফেঈ মযহাবভুক্ত। তিনি শিয়া শাসনের উজির হলেও খুবই জোরে শোরে শাফেঈ মযহাবের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। ইতিপূর্বে আলেকজান্দ্রিয়াতে অবস্থান কালে তিনি বেশ অনুসারী পান এবং সেখানে একটি সাফেঈ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। কায়রোতে নিজ ক্ষমতা সুদৃঢ় করার পর এখানেও সুন্নী মত প্রচার ও প্রসারের জন জনমত বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। যারা

www.waytojannah.com

সুন্নী ছিলেন তারা তো সাগ্রহে শিয়া খিলাফত উচ্ছেদের জন্য তৎপর। ইবনে সালার নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসা পরায়ন ছিলেন। তার প্রতিহিংসা চরিতার্থের ঘটনাও আছে। তবে একথা অবশ্যই সত্য যে হিংসা আর হত্যা কেবল এ দুইটিরই জন্ম দেয় বীভৎস রূপে। খলিফা ইবনে সালারের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন সেনাপতি আব্বাসের পুত্র নাসির উদ্দিন নাসিরকে। তিনি ছিলেন মিশরের খুবই পতিপতিত্ব ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। এই নাসির উদ্দিন নাসিরের শৈশব কাটে ইবনে সালারের গৃহে। সেখানেই তিনি প্রতিপালিত হন। একদা সেনাপতি আব্বাস তার পুত্র নাসির ও সিরীয় সেনাধ্যক্ষ্য উসামা এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে অভিযানে বহির্গত হন। যখন তারা কায়রো ত্যাগ করে সীমান্ত শহর বিলবেজে অবস্থান করছেন তখন সেনাপতি আব্বাস সুজলা সুফলা নীলনদ বিধৌত শস্য শ্যামল মনোহর মিশর ত্যাগ করে দীর্ঘদিন উষর ধূসর সিরীয়ায় থাকতে হবে বিধায় খুবই আফসোস করছিলেন। সেনাপতি আব্বাসকে সেনানায়ক উসামা প্রস্তাব দেন যে তিনি ইচ্ছা করলে আজীবন মিশরে থাকতে পারেন যদি ইবনে সালারকে হত্যা করে প্রধান উজিরের পদে বহাল হতে পারেন। প্রস্তাবটি সেনাপতি আব্বাসকে ভাবিয়ে তুললো। তখন পিতা পুত্র ও উসামা তিন জনে মিলে এক গভীর ষড়যন্ত্র করলো ইবনে সালারের হত্যার। নাসিরকে দিয়েই এটা সম্ভব। কেননা নাসির উজিরের বাসগৃহে অবাধে যাতায়াত করতে অভ্যস্ত এবং এতে করে কারো কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। যেমনি ভাবনা তেমনি কর্ম সম্পাদন। সেনাবাহিনী রেখে বিশ্বস্থ ক'জন ব্যক্তিকে নিয়ে নাসির সোজা সেনাপতির বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করলেন। কেউ বাধা দিল না। সন্দেহ করল না। কারণ সেনাপতি অন্দরমহলেই নাসিরের যাতায়াত অবাধ। শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে ঘুমন্ত উজির ইবনে সালারকে মুহূর্তের মধ্যে হত্যা করে নাসির দ্রুত গতিতে বাসভবন ত্যাগ করলেন। পরে উজিরের হত্যার খবর যখন দেহরক্ষীরা জানল তখন প্রকৃত হত্যাকারীর সন্ধানে তারা তল্লাসী শুরু করল। নাসির পিতার নিকট তার কর্মসম্পাদনের খবর দিলেন। আব্বাস শীঘ্রই নগরীতে ফিরে আইন শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং খলিফা কর্তৃক উজির পদে নিযুক্ত হলেন।

ইবনে সালারের নিহতের খবর নগরবাসীকে খুব একটা বিচলিত করেনি। কারণ তার নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতায় সকলেই শংকিত ছিল। ফলে আব্বাস উজির হওয়ায় পরিস্থিতি শান্ত ছিল। তবে খলিফা আব্বাসকে উজির করায় তার নিজ জীবনের বিরাট একটা বিপদ যেন উঁকি দিচ্ছিল। নাসিরের সাথে খলিফার সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। উভয়ে একই রকম সৌন্দর্য্যের ও সমবয়সের অধিকারী। তাদের সম্পর্কে উসামা অত্যন্ত জঘন্য উক্তি করে এবং সেটা চারিদিকে রাষ্ট্র করে দেয়। ফলে উজির আব্বাস তার পুত্র নাসিরকে ডেকে বলে তোমার সম্পর্কে খলিফাকে নিয়ে অনেক বাজে কথা কানে আসছে। অতএব তোমার ও আমার সম্মান অক্ষুন্ন রাখার মানসে খলিফাকে সরিয়ে দিতে হবে। নাসির অত্যন্ত কৌশলে তার নিজের বাড়ীতে গুপ্তঘাতকের দ্বারা খলিফাকে হত্যা করে মেঝের নিচে তার মৃতদেহ লুকিয়ে রাখে এবং এ ঘটনা তার পিতাকে বলে। পিতা পরদিন খলিফার প্রাসাদে গিয়ে তার খোঁজ নেন তিনি কোথায়? কেউ কিছুই বলতে না পারায় উজির তার দুই ভাইকে ডেকে পাঠান। তারা এলে তাদেরকে খলিফা হতে বলায় তারা যখন অস্বীকার করল তখন তারাই খলিফার হত্যাকারী বলে তাদেরকে হত্যা করা হয়। অতঃপর তার ৫বছর বয়স্ক বালক পুত্রকে খলিফা ঘোষণা করা হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

৫৪৯–৫৫৫ হিঃ
১১৫৪–১১৬০ খ্রীঃ

আবুল কাসিম ঈসা আল ফাইজ–বি–নাসরিল্লাহ

প্রতাপশালী উজির, আজ জাফিরের ৫ বছর বয়স্ক বালক আল ফাইজকে ফাতিমীয় খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেন। নিজেই সকল ক্ষমতার মালিক হয়ে নিহত খলিফার হত্যাকাণ্ডের দায়িত্বকে অন্যদের উপর চাপিয়ে নিরাপরাধ খলিফা ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যাকারী হিসাবে প্রাসাদে ও নগরে প্রচার করেও স্বস্তি পাচ্ছিলেন না উজির আব্বাস। প্রাসাদের আমিরগণ হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা আব্বাসকেই চিহ্নিত করে এবং তার হাত হতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তি ও তাকে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্য উচ্চ মুনিয়ার বনি কুরাইবের গভর্নর আর্মেনীয় আস সালিহ বিন রুজ্জিককে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। পত্র পেয়েই সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিহত খলিফার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আস সালিহ কায়রোর অভিমুখে যাত্রা করেন। কায়রোতে উপস্থিত হলে আমিরগণ এবং নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাকে সাদরে গ্রহণ করেন। উজির আব্বাস, পুত্র নাসির এবং কুচক্রী উসামা নগর ত্যাগ করে সিরিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিনা বাধায় কায়রোতে প্রবেশ করে আস সালিহ শাসন ভার গ্রহণ করেন। একজন যুবক খোজাকে সাথে করে আস সালিহ নাসিরের গৃহে প্রবেশ করে নিহত-খলিফার লাশ উদ্ধার করেন। এই খোজা খলিফার হত্যাকাণ্ডের সময় উপস্থিত ছিলেন। নগরবাসীর গভীর শোকাহত পরিবেশে খলিফাকে দাফন করা হয়। খলিফার ভগ্নি ফ্রাঙ্কদের নিকট একখানা মর্মস্পর্শী পত্র লেখেন আব্বাস ও তার পুত্রকে ধরিয়ে দিবার জন্য এবং বিনিময়ে ৬০,০০০ দীনার প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। এই পত্র পেয়ে অর্থের লোভে ফ্রাঙ্ক নাইটগণ আব্বাসের সন্ধান করে তাকে পায় এবং তাদের সাথে সংঘর্ষে আব্বাস নিহত হয় কিন্তু পুত্র নাসির বন্দী হয়।

একটি লৌহ খাঁচায় বন্দী করে নাসিরকে কায়রোতে প্রেরণ করা হলে ঘোষিত অর্থ নাইটদের প্রদান করা হয় এবং নাসিরকে নাক কান কেটে সমগ্র নগরে নির্যাতনের সাথে ঘুরান হয়। তারপর তাকে হত্যা করে নিহত খলিফার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এসব হত্যা ও কুকর্মের মূল প্রেরণা ও পরামর্শদাতা উসামা শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যায়।

এই সময়ে তুর্কীরা নুরুদ্দিনের নেতৃত্বে মিশর আক্রমনের চেষ্টা করে তারা সিরিয়া দখল করে ফ্রাঙ্কদেরকে উত্তরে বিতাড়িত করে এবং শক্তি সঞ্চয় করে মিশরও ফ্রাঙ্কদের ত্রাসে পরিগণিত হয়। এই সময়ে মাত্র এগার বছর বয়সে নাবালক খলিফা রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে।

www.waytojannah.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

৫৫৫—৫৬৭ হিঃ
১১৬০—১১৭১ খ্রীঃ

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল আদীদ

ফাইজের মৃত্যুর পর উজির সালেহ ইবনে রুজ্জিক ইচ্ছা করেছিলেন একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে খিলাফতের আসনে বসাতে। কিন্তু দরবারের পছন্দ মুতাবিক নিহত খলিফা জাফিরের ভ্রাতা ইউসুফের ৯ বছর বয়স্ক পুত্র আবু মুহাম্মাদ আব্দল্লাহকে আদীদ উপাধি দিয়ে ফাতিমীয় খিলাফতে খলিফা রূপে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আস সালিহ বিন রুজ্জিকের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা রইল।

ইবনে রুজ্জিক ফাতিমীয় শাসনকে আব্বাস ও তার পুত্র নাসিরের হাত হতে মুক্ত করে নিজকে যোগ্য ও সৎ শাসক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার এখন কাজ হোল মুসল-মানদের শত্রু ক্রুসেডারদের হাত হতে মিশরকে রক্ষা করা। তবে দরবার তার কড়া শাসনকে হিংসার চোখে দেখতে থাকে। ইবনে রুজ্জিক গোড়া শিয়া ছিলেন। তিনি কায়রোতে ইমাম হোসাইনে মাশাহাদ তৈরী করেন। ইমাম হোসাইনের জন্য জেরুজালেমে বদর আল জামালী একটি সমাধি সৌধ তৈরী করেন। কিন্তু ক্রুসেডারদের ধ্বংসযজ্ঞের আশংকায় সেখান থেকে ইমাম হোসাইনের প্রাপ্ত অস্থিগুলি এনে কায়রোর রাজকীয় কারাফা সমাধি ক্ষেত্রে সমাধিস্থ করেন এবং এই সমাধিতেই মাশহাদ তৈরী করা হয় এবং একটি মসজিদও নির্মিত হয়।

বয়ঃপ্রাপ্ত হলে উজির ইবনে রুজ্জিক স্বীয় কন্যার সাথে খলিফার বিবাহ দেন। কিন্তু এ বিবাহে খলিফার ফুফু মোটেই খুশী ছিলেন না বরং উজিরকে হত্যার জন্য মারাত্মকভাবে আহত করেন। আহত উজিরকে দেখতে গেলে খলিফাকে উজির তার ফুফুকে প্রানদন্ড এবং স্বীয় পুত্র রুজ্জিককে উজির নিয়োগের তাৎক্ষণিক দাবী করেন। খলিফা যথারীতি দাবী পূরণ করেন। অল্প দিনের মধ্যে ইবনে রুজ্জিকের মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন দ্বাদশ ইমামীয়া পন্থী এবং ফাতিমীয় শাসনের খুবই অনুগত। দেশপ্রেম ও সুশাসনের জন্য তিনিই ছিলেন উজিরদের সারিতে সর্বশেষ ব্যক্তি। শিল্প সাহিত্যে তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তার রচিত দুখন্ড কাব্যগ্রন্থ অদ্যাবধি রক্ষিত।

এই সময়ে ফাতিমীয় শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে তিনজন ব্যক্তির নাম খুবই উল্লেখযোগ্য। তারা হলেন রুজ্জিক, শাওয়ার ও দিরঘাম।

শাওয়ার ছিলেন উচ্চ মিশরের (Upper Egypt) গভর্ণর। পিতার মৃত্যু শয্যায় রুজ্জিককে এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। কারণ শাওয়ার খুবই উচ্চাভিলাসী এবং প্রতিহিংসা পরায়ন। সুযোগ পেলেই রুজ্জিকের প্রাণ নাশ করবে। রুজ্জিক শাওয়ারকে পদচ্যুত করেন। এই অজুহাতে শাওয়ার কায়রো অভিমুখে বিদ্রোহী বেশে

www.waytojannah.com

যাত্রা করেন। তিনি কায়রোতে এসে অত্যন্ত কৌশলে রুজ্জিককে হত্যা করে উজির পদটি দখল করেন। তবে রুজ্জিকের বিশ্বস্থ সেনাপতি দিরঘাম দরবার ও সেনাবাহিনীকে শাওয়ারের বিরুদ্ধে এনে শাওয়ারকে কায়রো ছেড়ে যেতে বাধ্য করেন। শাওয়ার বাধ্য হয়ে পালিয়ে সিরিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবার দিরঘাম উজির হলেন।

সিরিয়ায় সেই সময় নূরুদ্দীন জঙ্গী ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। শাওয়ার নূরুদ্দীন জঙ্গীকে মিশর জয়ের পরিকল্পনা দেন। মিশরে ফাতিমীয় খিলাফত ও দিরঘামের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেই খুশী ছিলেন না বরং জঙ্গীকে বলেন যে মিশর সহজেই বিজিত হবে এবং নূরুদ্দীনের পক্ষে শাওয়ার মিশরের উজির হিসাবে কাজ করে যাবেন। ইতিপূর্বে ফাতিমীয়দের পক্ষ হতে একবার মৈত্রীর আমন্ত্রণ নূরুদ্দীনের নিকট এসেছিল। এবার নূরুদ্দীন অবস্থা অনুকূল বিবেচনা করে সেনাপতি শিরকুহের নেতৃত্বে বিশাল তুর্কী বাহিনী মিশর অভিযানে প্রেরণ করেন। সংগে সহযোগী সেনানায়ক হিসাবে প্রেরিত হন সালাহদ্দিন বিন আইয়ুব। আর শাওয়ার পথনির্দেশিক ও পরামর্শক হিসাবে রইলেন।

মিশরের উজির হিসাবে দিরঘাম শাসন কার্য ভালভাবেই চালাচ্ছিলেন, কিন্তু তার শত্রু ছিল ত্রিমুখী–শাওয়ার, ক্রুসেডার ও তুর্কীরা। তিনি নিয়মিতভাবে ক্রুসেডারদের কর দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে তা বন্ধ করে দেন। ফলে ৫৬০ হিজরীতে জেরুজালেম অধিপতি ফ্রাঙ্ক শাসক আমালরিক ক্রুদ্ধ হয়ে মিশর অভিযান করেন। সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে মিশরে নীল নদের প্লাবনে সারাদেশ প্লাবিত হয়। বাধ্য হয়ে ফ্রাঙ্করা তাদের অভিযান ত্যাগ করে সামান্য কর নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে বিপদ কেটে যেতে না যেতেই তুর্কীদের মিশর অভিযান শুরু হয়। দিরঘাম রাজধানী দৃঢ়তার সাথে রক্ষা করছিলেন কিন্তু রসদের অপ্রতুলতায় একটি মারাত্মক ভুল করে বসেন–ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির উপর হাত দিয়ে। জনগণ ক্ষিপ্র হয়ে উঠে। ঘন্টার পর ঘন্টা উজির রাজ দরবারের বাইরে সাহায্যের আশায় ও আবেদনে অপেক্ষায় রইলেন কিন্তু খলিফা কোন প্রকার সাহায্য করেন নি। দিরঘামের সাথে ৫০০ অশ্বারোহী ছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। মাত্র ৩০ জনকে সাথে নিয়ে চলে যাবার সময় ক্ষিপ্ত জনতার হাতে দিরঘাম নিহত হন।

এই সময়ে শাওয়ার তার সাহায্যকারী বাহিনী তুর্কীদের নিয়ে নগরে প্রবেশ করেন এবং অতি সহজেই শাওয়ার তার অভিলাষ পূর্ণ করেন উজির পদটি লাভ করে। তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফ্রাঙ্কদের মিশর দখলের সুযোগ করে দিলে অত্যন্ত দুঃখের সাথে তুর্কীরা সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করে। শাওয়ার মিশরের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন। এদিকে তুর্কীরা নূরুদ্দীনকে চাপ দিতে থাকে মিশর দখলের জন্য। নূরুদ্দীন আব্বাসীয় খলিফার অনুমতি নিয়ে ২৩০০ অশ্বারোহীসহ বিশাল বাহিনী দিয়ে শিরকুহ ও সালাহউদ্দিনের নেতৃত্বে মিশর জয়ের উদ্দেশ্যে তুর্কী বাহিনী প্রেরণ করেন।

তুর্কীদের আগমনের সংবাদে বিচলিত হয়ে শাওয়ার আবার ফ্রাঙ্কদের আমন্ত্রণ জানান।

www.waytojannah.com

ফ্রাঙ্কদের আগমনের পূর্বেই তুর্কীরা মিশরে পৌছান। তারা নীল নদ অতিক্রম করে পশ্চিম তীরে অবস্থান নেন। ফ্রাঙ্করা এসে পূর্ব তীরে অবস্থান নেয়। তুর্কীরা গিজায় ও ফ্রাঙ্করা ফুসতাতে পৌছায়। এই সময় ফ্রাঙ্কবাহিনী প্রধান ও রাজা আমালরিক ফাতিমীয় খলিফার সাথে সাক্ষাত করেন এবং বিরাট অংকের অর্থের বিনিময়ে তুর্কীদের মিশর থেকে বিতাড়িত করার চুক্তি হয়। তুর্কীদের বিতাড়ণের জন্য ফ্রাঙ্কদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শাওয়ার এ ব্যাপারে অত্যন্ত জঘন্য ও ধ্বংসাত্মক কাজটি করে ফুসতাত নগরী ভস্মীভূত করে। শতাব্দীর সভ্যতা বিনষ্ট হয় কেবল মাত্র আমর বিন আল আসের মসজিদটি অক্ষত থাকে। খলিফা স্বয়ং এবং নগরের অভিজাত রমনীরা নূরুদ্দীনের নিকট আকুল আবেদন জানায় ফ্রাঙ্কদের বিতাড়নের জন্য। এবার শিরকুহ ও সালাহউদ্দিন বীর বেশে কায়রোতে প্রবেশ করেন এবং তাদেরকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেয়া হয়। শাওয়ারের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য তাকে বন্দী করা হয় এবং পরে তার শিরোচ্ছেদ করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। উজির পদে শিরকূহকে নিয়োগ করা হয় এবং যারতীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা শিরকূহ গ্রহণ করেন। নাম মাত্র খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন তবে নূরুদ্দীনের প্রতি তার বিশ্বস্ততার বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। তিনি মাত্র ২ মাস জীবিত ছিলেন। তার মৃত্যুর পর খলিফা সালাহ উদ্দিনকে উজির পদে নিয়োগ করেন। কারণ সালাহউদ্দিন চরিত্রে, সততায়, বীরত্বে, সাহসিকতায় ও ক্রুসেডারদের হাত হতে মুসলিম রাষ্ট্র রক্ষার জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য ছিল ও যথোপযুক্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সালাহউদ্দিন যেমন খলিফার নিযুক্ত ও অনুগত ছিলেন তেমনি নূরুদ্দীনের ও ভক্ত ছিলেন। সালাহউদ্দিনের পিতা আইয়ুব মিশরে আগমন করলে তাকে উজির পদ গ্রহণের অনুরোধ জানালে তিনি সালাহউদ্দিনকেই উপযুক্ত মনে করে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। নূরুদ্দীনের আর আব্বাসীয় খলিফার পক্ষ থেকে বারংবার চাপ আসতে থাকে খুতবা সুন্নী খলিফা নামে পাঠের জন্য। এমন সময় একজন পারশিয়ান আমীর ৫৬৭ হিজরীতে জুমুআয় আব্বাসীয় খলিফার নামে খুতবা পাঠ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ কেবল অবাক হয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি তাকাতে থাকে কিন্তু কোন প্রতিবাদ করেনি। এই খুতবা পাঠের মধ্য দিয়েই ফাতিমীয় খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই সময়ে খলিফা আল আদীদ গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। সালাহ উদ্দিন তাঁকে সংবাদটি দেননি কারণ তিনি জানতেন আদীদের জীবন প্রদীপ নিবু নিবু। অতএব ফাতিমীয় খিলাফতের দীপটিও যে নিভে গেছে ইতিমধ্যে এ দুঃসংবাদটি না জেনেই আসন্ন মৃত্যুর পথযাত্রী শেষ খলিফার জীবনাবসান ঘটুক শান্তির সাথে। ক'দিন পরেই খলিফা আদীদ ইন্তেকাল করেন ১২ বছরের শাসন শেষে। আর এখানেই শেষ হোল ফাতিমীয় খিলাফত। ফাতিমীয় শাসনের শেষ মুহূর্তটি এমনভাবে চলে গেল যা নির্মম ছিল না অথচ দৃশ্যটি ছিল করুণ।

The members of Saladin's Suite debated whether he ought to be informed of the change, but it was agreed that if he recovered it would then be time enough to tell him, and if he did not recover he might as well die in peace Without knowing that his dynasty had fallen shortly afterwards he died in this peaceful ignorance.[১]

---

১. Delacy O'Leary DD-A Short history of the Fatimid Khalifate P.243

www.waytojannah.com

আবু আবদুল্লাহ আল মায়মুনের প্রচার প্রচেষ্টায় যে শিয়া মতবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তর আফ্রিকায় এবং তার উপরই উবায়দুল্লাহ আল মাহদী ফাতিমীয় খিলাফতের যে বৃক্ষটি রোপন করেন কায়রোয়ানে তা ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে মিশরের কায়রোতে এসে তার প্রবৃদ্ধি দ্রুতগতিতে হতে থাকে এবং তা প্রায় পৌনে তিনশ' বছর পর জীর্নশীর্ণ অবস্থায় কায়রোতেই ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায় আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল আদীদের অজান্তে তারই রোগ শয্যায়। ধীরে ধীরে রোগশয্যা খলিফার মৃত্যু শয্যায় পরিগণিত হয় এবং ফাতিমীয় খিলাফতও ধ্বসে পড়ে কাউকে আহত না করেই ৫৬৭ হিজরীতে।

The last of the Fatimids, happily never learnt the secret of his deposition. He had been a recluse in his palace since the arrival of Saladin, and when his name was Suppressed he lay dying. The news was mereifully withheld from him, and the last of the famous dynasty. Which had been given such great opportunits and had misused them so contemptibly, died three days later, ignorant of his fall. [১]

ফাতিমীয় খিলাফতের কেন পতন ঘটলো?

আব্দুল্লাহ বিন মায়মুন আর উবায়দুল্লাহ আল মাহদী যে উৎসাহ অনুপ্রেরণা ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে ফাতিমীয় শক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ শেষ খলিফা পর্যন্ত অব্যাহত থাকেনি। চারিদিকে সুন্নী খিলাফত। এশিয়া আফ্রিকা জুড়ে আব্বাসীয়দের শাসন। ইউরোপে আব্বাসীয়গণ না থাকলেও উমাইয়ারা স্বাধীনভাবে শাসন করছিলেন। তারাও সুন্নী। ফলে গোটা মুসলিম জাহানে সুন্নীদের প্রবল বিরোধীতার মোকাবেলা করেই শিয়ামতবাদ পুষ্ট ফাতিমীয় খিলাফতের অস্তিত্ব টিকে রাখার প্রশ্নটি ছিল মুখ্য। প্রথম দিকের খলিফাগণ রাজ্য শাসনের সাথে সাথে প্রচারের কাজে উৎসাহ ব্যঞ্জক কর্মকান্ডের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই প্রচারের কাজে ভাটা পড়ে। জনগণের মন মগজ তখন শিয়ামত থেকে অন্যদিকে ধাবিত হয়। উপরন্তু শিয়ামতের বহুধা বিভক্তি প্রচারকে দারুণভাবে ব্যাহত ও বিঘ্নিত করে। ৪৮৭ হিজরীতে মুসতানসিরের মৃত্যুর পর ফাতিমীয়দের একটি উপদল নিজারীয় নামে আত্মপ্রকাশ করে। হাসান বিন সাব্বাহ-Old man of the Mountaion বা শাইখ আল জিবাল উপাধিধারী এই ব্যক্তি প্রচার কাজে অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন। তার দল সরাসরি ফাতিমীয় শাসনের বিরোধী হয়ে উঠে। দশম খলিফা আমিরের মৃত্যুর পর ৫২৪ হিজরীতে তাইয়েবী নামে আরো একটি উপদলের জন্ম হয়। ফাতিমীয় রাজ্যে ইসমাইলীয়, নিজারীয় তাইয়েবীয়, দারাজী, কারামাতীয় প্রভৃতি দল উপদলগুলি মিশর, সিরিয়া, ইয়েমেন, ভারত, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলে স্বতন্ত্র পরিচয় ও পতাকা নিয়ে প্রচার কার্যের ফলে শিয়া মতবাদের খুবই ক্ষতি হয় যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে ফাতিমীয় খিলাফতে। উপরন্তু উগ্রপন্থী কারমাতিয় সম্প্রদায় ইতিপূর্বে মুসলিম বিশ্বের

১. Stanely Lane Poole-A histroy of Egypt. P.P. 193

www.waytojannah.com

Contents

মিলন - কেন্দ্র পবিত্র কা'বা আক্রমণ করে হজরে আসওয়াদ লুণ্ঠন করায় সুন্নী এবং মধ্যমপন্থী শিয়ারা সর্বদাই তাদের প্রতি বিতৃষ্ণ ও আশংকিত ছিল। এটা বিশেষ করে সুন্নীদের জন্য মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করে এবং এর প্রতিশোধের বাসনা বংশ পরম্পরায় চলে আসতে থাকে সুযোগের অপেক্ষায়। খলিফা হাকিমের চঞ্চলমতি, উদ্ভট পরিকল্পনা ও খেয়াল প্রসূত নিষ্ঠুর কার্যাবলী শীয়া খিলাফতের সামরিক শক্তির যথেষ্ঠ ক্ষতি সাধন করে এবং জনমনে জীবন নাশের আশংকা সৃষ্টি হয়। ষড়যন্ত্র, কূট চক্রান্ত এবং ঈর্ষা ও হিংসাবশতঃ হত্যা ও বিশ্বাসঘাতকতা যেন দরবারের এক চলমান ঐতিহ্যে পরিণত হয়।

মিশরের নীল নদের সুপ্রবাহের উপরই কার্যতঃ শাসনের সুফল নির্ভর করত। ক্রমাগত অজন্মা, খাদ্যাভাব মিশরকে দারুণভাবে দুর্বল করে দেয়। ফলে সময় সময় বাইরের শত্রু শক্তির নিকট নিতান্ত হীনশর্তে সাহায্য চাইতে হোত। এর প্রভাবে অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট হোত। সেনাবাহিনীর মধ্যে জাতীয়তাবাদ সংঘর্ষ ঘটত। সুদানী, আরমেনীয়, মিশরীয় তুর্কী ও বার্বার প্রভৃতি জাতি ও গোত্র ভিত্তিক পরিচয় এমন প্রবল সংঘর্ষ সূচনা করে যার ফলে রাজস্বের ঘাটতি মুকাবিলা করতে রাজদরবারের সঞ্চিত সম্পদ রত্ন অলংকারও টান পড়ে।

সেনাবাহিনী, দেহরক্ষী বাহিনী, প্রাসাদ বাহিনী প্রভৃতির সমর শক্তি অনেকাংশে নিম্নে নেমে যায়। তারা দুর্বল খলিফার আমলে দুর্লভ উজিরের পদটি দখলের জন্য মেতে উঠে। শক্তি সাহস অর্থ ও জনবল যথেষ্ট এ কাজে ব্যয় করে। হত্যার রাজনীতি শুরু হয়। বহিঃশক্তির মুকাবেলার ক্ষমতা ক্রমশ হারিয়ে ফেলে। ফলে উত্তর আফ্রিকা হাতছাড়া হয়ে যায়। জেরুজালেম, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলও চলে যায়। কেবলমাত্র মিশর তাদের অধিকারে থাকে। রাজ্য সংকুচিত হবার সাথে সাথে রাজস্বও হ্রাস পায়।

অন্যদিকে খলিফা, আমীর, উজির সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চ পদগুলিতে যারা সমাসীন তাদের আরাম আয়েশ, শান শওকত, বিলাস ব্যসন ও জাকজমক যেন দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনগণের দেয় রাজস্ব জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে ব্যক্তির বিলাসে খরচ হতে থাকে। আরামপ্রিয় খলিফারা রাজ্যশাসন উপেক্ষা করে হেরেম নিয়ে মগ্ন থাকেন। উজির গণ এই অনভিপ্রেত অনুপস্থিতিটাই তাদের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি রূপে গ্রহণ করেন। শক্তিশালী উজিরবৃন্দ দুর্বল খলিফার সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন।

ফাতিমীয় খলিফাগণ যেহেতু বংশানুক্রমিক শিয়ামতবাদপুষ্ঠ ধর্মীয় অনুভূতিতে সৃষ্ট এক অদৃশ্য ঐশ্বরিক মনোনয়নে ইমামরূপে বরিত ব্যক্তিত্ব সেহেতু এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক নাবালক খলিফার উপস্থিতি দৃশ্যমান। খিলাফতের শেষ দিকে এই নাবালক খলিফার অভিভাবকত্বে উজিরগণ বেনযীর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তাদেরই মর্জি মোতাবেক খলিফার উত্থান পতন ঘটাত। খলিফারা আর কার্যতঃ রাজ্য শাসন করতেন না। তাদের কেবল কাজ ছিল হুকুমনামায় স্বাক্ষরদান, সালাম গ্রহণ এবং হেরেমে বিলাসী জীবন যাপন। মুদ্রায় আর খুতবায় খলিফার নাম উচ্চারিত হোত রীতি মাফিক। এর ফলে খিলাফতের পতন তরান্বিত হয়।

ভূমধ্য সাগর আর লোহিত সাগর হাতছাড়া হয়ে যাবার ফলে বহিঃ বাণিজ্যে প্রভূত ক্ষতি

www.waytojannah.com

সাধন হয়। উত্তর আফ্রিকা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় এবং জেরু জালেমে ক্রুসেডারদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মিশর বাণিজ্যে ত্রিমুখী শত্রুর মুকাবেলায় পড়ে। ব্যবসা বাণিজ্য ধীরে ধীরে গুটিয়ে আসে। ব্যয়ভার বহনের জন্য মিশরবাসীকে প্রচুর করভারের বোঝা বইতে হয়।

খলিফাদের অযোগ্যতা, শাসনকার্যে অবহেলা, জনকল্যাণে অমনোযোগী, সামরিক বাহিনীর প্রতি উপেক্ষা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক খলিফার মনোনয়ন, প্রভৃতি সহ শক্তির কেন্দ্র বিন্দু ইমাম হয়ে পড়েন এক অসহায় ব্যক্তিত্ব। খিলাফতের পতনের জন্য এহেন কাজ রাজ দরবারে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। মধ্যযুগে যে সময়ে শক্তির উৎস হিসাবে সামরিক বাহিনীর শৌর্যবীর্য, রনকুশলতা, দক্ষতা ও সাহসিকতা অপরিহার্য সেই সময়ে ফাতিমীয় শাসনের শেষার্ধে সামরিক বাহিনী গোষ্ঠী কলহে আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। জনগণের নিরাপত্তার ও রক্ষাকবজ হিসাবে সেনাবাহিনীর প্রতি সকলের যখন শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকার কথা অথচ তখনই তারা জনগণের জানমাল ইজ্জতের হরণকারী রূপেই পরিচিত হয়ে উঠেন। জন নিরাপত্তার খাতিরেই তো বহিশত্রুর নিকট মিত্র ভেবে আকুল আবেদন জানাচ্ছে পুর মহিলারা– ফ্রাঙ্ক তুর্কীদের নিকট তাদের জান ও ইজ্জতের জন্যই। পতণের ঘন্টা ধ্বনি এমনিভাবে বাজতে শুরু করে।

ফাতেমীয় খিলাফতকে তিনভাগে বিভক্ত করে পূর্বাপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার প্রয়োজন।

প্রথমতঃ খিলাফতে প্রতিষ্ঠা ইসমাইলী মতবাদ প্রচার প্রসার থেকে।

দ্বিতীয়তঃ কায়রোয়ান থেকে রাজধানী মিশরে স্থানান্তর এবং সিরিয়ার উপর প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয়তঃ ক্রুসেডারদের আক্রমণ এবং সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর হাতে পতন।

প্রথম অধ্যায়ে ইসমাইলীয় মতবাদ বিভিন্ন স্থানে প্রচার ও প্রসারকল্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়ী বা প্রচারকবৃন্দ প্রেরণ। উত্তর আফ্রিকায় প্রচারের প্রসারতা বৃদ্ধি এবং কায়রোয়ানে আগলাবীয় শক্তির পতন ঘটিয়ে ফাতিমীয় খিলাফতের পত্তন। কেন ফাতিমীয়দের এ সাফল্য? উত্তরে এটাই বলা যেতে পারে যে এ সময়ে আব্বাসীয় খিলাফতের দারুণ নাজুক অবস্থা বিরাজ করছিল। দুর্বল খলিফাদের অযোগ্যতার শাসনের রশি দিন দিন গুটিয়ে আসছিল আর প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ জাতীয়তাবাদী শক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কেন্দ্রীয় প্রভাব কেবল মুদ্রায় আর খুতবায় সীমিত হয়ে পড়ে। সময়টা মোটামুটিভাবে ৮৭৩–৯৬৬ সালের মধ্যে। ৮০৮ সালে আব্বাসীয় প্রতাপশালী খলিফা হারুণ অর রশিদের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র আমীন ও মামুন খিলাফত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। আমিন আরবীয়দের প্রতিনিধি আর মামুন পারশিয়ানদের বিপুল সমর্থন পুষ্ট। সংঘর্ষে পারশিয়ানদের বিজয় হয়। কিন্তু পারশিয়ানদের বিজয় হলেও খিলাফতের ঐক্যের ফাটল রোধ করা সম্ভব হয়নি। ৮২০ সালে খোরাশানে তাহিরীয় রাজবংশের অভ্যূদয় ঘটে। তারা কার্যত স্বাধীনভাবেই বংশীয় শাসন করতে থাকে নামমাত্র খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। তাহির যদিও আরব ছিলেন কিন্তু তার অনুসারীরা প্রায় সকলেই পারশিয়ান। ফলে পারস্য প্রভাব খোরাশানে প্রবল হয়ে উঠে। এর পর ২৬০ হিজরী থেকে ২৯০ হিজরী পর্যন্ত খোরাশানে সাফফারীদদের শাসন চলে এবং

www.waytojannah.com

তারাও অনারব পারশিয়ান। অতঃপর সামানীয়রা ২৮৮ হিজরী থেকে ৪০০ হিজরী পর্যন্ত খোরাশানের ভাগ্য নির্ণয় করে। তারাও অনারব। তবে প্রাদেশিক রাজ্য থেকে খোদ রাজধানী বাগদাদকে কব্জা করার জন্য কাম্পিয়ান সাগর কূল থেকে বুয়াইদরা চলে আসে। তারা ৪৪৭ হিজরী পর্যন্ত বাগদাদকে নিয়ন্ত্রন করে। বুয়াইদগণ কেবল পারশিয়ান ছিলেন তাই নয় বরং সাফফারীয় ও সামানীয়দের মত তারাও শিয়া ছিলেন। বাগদাদের খলিফা কেবলমাত্র আলংকারিক প্রধান রূপে শ্রদ্ধা পেতেন। উত্তর আফ্রিকায় তখন ফাতিমীয় শাসন আর পশ্চিমে কর্দোবাতে উমাইয়া খিলাফত। তাহলে কার্যতঃ একই সময়ে তিনটি খিলাফত। এটা ইতিপূর্বে ছিল অভাবনীয় ও অকল্পিত। অবশ্য এই সময়ে এশিয়া ভূখন্ডে আমুদরিয়া পাড়ি দিয়ে তুর্কিরা মুসলিম হয়ে পারস্যভূমিতে বিপুল সংখ্যায় যেমন প্রবেশ করতে থাকে তেমনি পশ্চিমে অর্থাৎ ইউরোপে উত্তর পশ্চিমে সাগরকূলের মানুষেরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে আশ্রয় নিতে থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে তখন মুসলিম শাসনের তিনটি স্বতন্ত্র খিলাফত। বাগদাদ অর্থাৎ এশিয়াতে সুন্নী আব্বাসীয়রা, কায়রো অর্থাৎ আফ্রিকায় শিয়া ফাতিমীয়রা আর ইউরোপের স্পেনে উমাইয়া সুন্নীরা কার্দোবাতে স্বতন্ত্র খিলাফতের শাসন অব্যাহত রাখে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টি ৯৬৬–১০৭৬ এই সময়ের মধ্যে। এটা ফাতিমীয়দের স্বর্ণযুগ বা অধ্যায় বলে ভুল হয় না। এ সময়ে আব্বাসীয়দের পতন দ্রুত গতিতে নেমে যাচ্ছিল। ফাতিমীয়রা প্রবল শক্তি সঞ্চয় করে সিরিয়া প্যালেষ্টাইন এবং আরব উপদ্বীপেও তাদের ক্ষমতা বিস্তার করে। এই সময়ে পশ্চিমে বাইজানটাইন শাসকরাও বেশ প্রবল ছিল। ফাতিমীয়দের সাথে তাদের শক্তি পরীক্ষা হয়। ভূমধ্য সাগরে কেবল বাগদাদের খলিফার সাথে বাইজান টাইনদের সংঘর্ষ হয়। ধীরে ধীরে ক্রীট মিসিলীতে গ্রীক প্রাধান্য কায়েম হয় এবং এশিয়াতে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও জেরুজালেমে গ্রীকদের সাথে মুস-লিমদের যে সংঘর্ষ হয় তাই ক্রুসেড নামে খ্যাত। ক্রুসেডারদের সাথে ফাতিমীয়রা যেন হিমসিম খাচ্ছিল এবং শেষ পর্যন্ত জেরুজালেম হস্তচ্যুত হয়।

এই সময় তুর্কীদের অভ্যুথান এশিয়া ও আফ্রিকার মানচিত্র পরিবর্তন করে দেয়। খোরাশানের সামানীয়রা তুর্কীদের সেনাবাহিনীতে বিপুল সংখ্যায় নিয়োগ করে। এই সেনাদলের মধ্যে জনৈক আলপ্তগীনকে খোরাশানের গভর্ণর করা হয়। প্রাসাদ সংঘর্ষে ও সামানীয় উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে আলপ্তগীন খোরাশান ছেড়ে চলে আসে পর্বত সংকুল গজনীতে। সেখানে তার পুত্র সবুক্তগীন সামানীয় প্রতিনিধিরূপে থাকলে কার্যতঃ স্বাধীন ছিলেন। অতঃপর সুলতান মাহমুদ ৯৯৯ সালে গজনীকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করেন এবং আব্বাসীয় খলিফার সনদ লাভ করেন। তিনি বারংবার আক্রমন করে সুনাম ও সম্পদ উভয় অর্জন করলেও ভারত বিজয় করে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি। তিনি কাম্পিয়ান সাগর পর্যন্ত তার ক্ষমতা বিস্তার করেন এবং স্বজাতি তুর্কীদের সাথে সংস্পর্শে আসেন যারা আমুদরিয়া পাড়ি দিয়ে পারস্যে আসছিল। এই তুর্কীরা সেলজুক গোত্রের ছিল। তারা ভারতের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে পারস্য, সিরিয়া ও ইরাকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

www.waytojannah.com

মাহমুদ তুর্কী এবং সুন্নী। তবে তার শাসন কার্য পরিচালনা করত পারসিয়ানরা। তাদের ভাষা ফার্সী এবং এর সাথে মিশ্রন ঘটে আরবীর। তবে এ কথা স্পষ্ট যে তুর্কীরাই সুন্নী এবং তারা আব্বাসীয় খিলাফতের দৃঢ় সমর্থক। অন্যদিকে সাফফারীদ, সামানীদ ও বুয়াইদ সকলেই পারশিয়ান এবং শিয়া। সেলজুক তুর্কীরা তুর্কীস্থান থেকে বলখে বসতি স্থাপন করে ৯৫৬ সালের দিকে এবং ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে। তারপর ক্রমাগতভাবে বিক্ষিপ্ত দলে তারা আমুদরিয়ার উপরে যেতে থাকে। ২০০০ তুর্কী মুহাজিরের একটি দল ইস্পাহানে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইস্পাহানের গভর্ণর তাদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সুলতান মাহমুদ তা অনুমোদন করেননি। উপরন্তু তাদেরকে বন্দী করে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার হুকুম দেন। এহেন অপ্রত্যাশিত সংবাদে তারা বিচলিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে দস্যু বৃত্তিতে জীবিকার অন্বেষণে ছড়িয়ে পড়ে। জনৈক তুঘরিল তাদের নেতৃত্ব দেন। জনজীবন বিপর্যস্ত হলে সুলতান মাহমুদ তাদেরকে ক্ষমা করেন। খোরাশানে গজনীর শাসন সুপ্রতিষ্ঠার আশ্বাসে তারা খোরাশানে চলে যায়। তবে সুলতান মাহমুদের পর তার পুত্র মাসুদের সময় খোরাশান গজনীর প্রভাব মুক্ত হয় এবং পারস্যও হাতছাড়া হয়ে যায়। তুঘরিলের নেতৃত্বে সেলজুকুরা খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ সময়ে বাগদাদের খলিফা আল কাইমবিল্লাহ বুয়াইদদের হাত হতে নিস্কৃতির জন্য তুঘরিলের সাহায্য কামনা করেন। কালবিলম্ব না করে তুঘরিল স্বসৈন্যে বাগদাদে গমণ করে বুয়াইদের পরাজিত করে বাগদাদের খলিফার শক্তি পুনরুদ্ধার করেন ৪৪৭ হিজরীতে।

বুয়াইদদের পরিবর্তে সেলজুক তুর্কীরাই আব্বাসীয় খলিফার অভিভাবক হলো। পরিবর্তন এটুকুই ছিল যে তারা আব্বাসীয় সুন্নী খিলাফতের দৃঢ় সমর্থক। তুঘরিলের উত্তরসূরী আলপ আরসালান ফাতিমীয় ও গ্রীকদের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তুর্কীরা এসময় এত বেশী শক্তি সঞ্চয় করে যে তারা জর্জিয়া আরমেনীয়া দখল করে বাইজইনটাইন শক্তিতে কার্যতঃ কোনঠাসা করে ফেলে। ৪৬০ হিজরীতে তুর্কী বা সমগ্র এশিয়া মাইনর বাইজানটাইন অধিকার মুক্ত করে। তবে এন্টিয়ক তখনও গ্রীকদের দখলে। এটাই সেলজুকদের বিপদের কারণ হয়ে দাড়ায়। আলপ আরসালাক পর মালিক শাহ এশিয়া মাইনরে শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে জেরুজালেম ফাতিমীয়দের হাত হতে দখল করে নেন। বাগদাদের খলিফার প্রধান সেনাপতিরূপেই তিনি পশ্চিম এশিয়ার মালিক হয়ে যান। ঠিক এই সময় পর্যন্তই ফাতিমীয়দের সুদিন ছিল। এরপর তাদের দুর্দিন শুরু হয়। সমগ্র ইউরোপ এ সময় ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে ধর্মের পতাকাতলে। যীশুর পবিত্রভূমি প্যালেষ্টাইন মুসলমানদের হাত হতে উদ্ধার কল্পে তারা ধর্মযুদ্ধের ডাক দেয় যা ক্রুসেড নামে পরিচিত।

ফাতিমীয়দের পতনের যুগ

৪৬১—৫৬৪ হিঃ
১০৭৬—১১৬৮ খ্রীঃ

সমগ্র এশিয়া মাইনর তুর্কীদের দখলে। বাইজানটাইন প্রভূত্ব এশিয়া মাইনরে কার্যতঃ শেষ। তুর্কীদের নজর এবার মিশরের দিকে। তিনটি বৃহৎ শক্তি এ সময় বিদ্যমান। বাইজানটাইন, ফাতিমীয় আর সেলজুক তুর্কী। প্রথম দু'টি ক্ষয়িষ্ণু এবং তৃতীয়টি দ্রুত বেগবান প্রথম দুটিকে গ্রাসউদ্যত। এই সময়ে ইউরোপে ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রণদামামা বেজে উঠে। ক্রুসেডের পতাকা তলে হাজার হাজার খৃষ্টান ধর্মান্ধযোদ্ধা জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য জমায়েত হয় এবং তারা ১০৯৭ সালে এশিয়াতে উপস্থিত হয়। তাদের উপস্থিতি বাইজানটাইন ও ফাতিমীয় উভয়ই স্বাগত জানায়। প্রথম দল স্বাগত জানায় সংগত কারণেই স্বজাতির মান সম্মান ও জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য কিন্তু ফাতিমীয়রা স্বাগত জানায় স্বজাতির বিনাশের জন্যই অর্থাৎ তুর্কী শক্তি নিপাত যাক গ্রীকরা ভাল থাক এই অদূরদর্শী আত্মবিনাশী ভাবনায়। ফলাফল হোল ক্রুসেডারদর পক্ষেই। তারা জেরুজালেম, এডেসা, এন্টিয়ক, এবং সিরিয়ার বেশ কিছু অংশ দখল করে নিজেদেরকে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। তথাপিও ফাতিমীয়দের হুশ হয়নি। কায়রোতে উজিরদের হত্যাযজ্ঞ আর খলিফার সিংহাসন বিপদমুক্তির জন্য মুসলমানদের শত্রু খৃষ্টান ক্রুসেডারদের বন্ধুত্ব চাইল। চাইল সহযোগিতা আর সাহায্য। এমনকি যখন তুর্কীরা মিশরের উপকণ্ঠে যখন তাদের শক্তি, ক্ষমতা, সেনা, সম্পদ বলতে আর উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই, তখনও বিরাট অংকের ধনরত্ন স্বর্ণমুদ্রা প্রদানে ক্রুসেডারদের সম্মত করল সেলজুকদের প্রতিহত করার জন্য। কিন্তু শেষ রক্ষা হোল না। সেনাপতি সালাহউদ্দীনের গতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। মিশরে তুর্কী সেনারা বিজয়ী বেশে প্রবেশ করল আর ফাতিমীয় পতাকার পরিবর্তে সুন্নী আব্বাসী খেলাফতের পতাকা উড্ডীন হলো। ২৬২ বছরের ফাতিমীয় শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটল এমনিভাবে। মিশরে যখনই দুর্বল খলিফার উপস্থিতিতে শক্তিশালী উজিরদের শাসন ক্রমাগতভাবে চলতে শুরু করে তখনই পতণের ধ্বস দ্রুত নামতে থাকে। উজিরের হাতে খলিফা ক্রীড়ানক বা অসহায় খেলনার পুতুল কিভাবে একটা শাসনকে সুসহংত ও ঐক্যবদ্ধ ও মজবুত রাখতে পারে? মিশরের অধিকাংশ উজিরের শেন দৃষ্টি ছিল ক্ষমতালাভ ও সম্পদ হরণ। এ দৃষ্টি নিয়ে খিলাফতকে পাহারা দিয়ে কত সময় রাখা যায় যখন সীমান্তে শক্তিশালী তুর্কীরা এক দিকে আর ক্রুসেডাররা অন্য দিকে? সাধারণ জনগণ সর্বদা চায় একটা শক্তিশালী শাসক। যিনি নিজ দেশকে রক্ষা করতে সক্ষম এবং বহিঃশত্রুদের মুকাবেলা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেশের কল্যাণ কার্যে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর বীরত্ব বজায় রাখতে কৃতসংকল্প। ঠিক এমনই একজন শাসক, সেনানায়ক ছিলেন সালাহ উদ্দিন। যাকে মিশরের লোকেরা স্বাগত জানায় সানন্দে। তার দ্বারাই সিরিয়া ও জেরুজালেমের ক্রুসেডদের মর্মান্তিক পরাজয় ঘটে। গাজী সালাহ উদ্দীন ইসলামী জগতে স্মরণীয় বীর সেনানীরূপে আজও সুপরিচিত মুসলিম জাতির গর্ব ও গৌরবরূপে নন্দিত।

www.waytojannah.com

ফাতিমীয়দের বংশ তালিকা

হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ৬৩২

১· হযরত ৬৬১ আলী (রাঃ) + ফাতিমা (রাঃ) ৬৩২

২· হযরত হাসান (রাঃ) ৬৬৯

৩· হোসাইন (রাঃ) ৬৮০
৪· আলী জয়নুল আবেদীন ৭১২
৫· মুহাম্মাদ আল বাকের ৭৩১
৬· জাফর আস সাদেক ৭৬৫
৭· ইসমাইল ৭৬০

অথবা ৭· মুহাম্মাদ
ইসমাইল
মুহাম্মাদ
আহমদ
আব্দুল্লাহ
আহমদ
হোসাইন
আব্দুল্লাহ

৭· মুসা আল কাজিম ৭৯৯
৮· আলী আর রিজা ৮১৮
৯· মুহাম্মাদ আল জাওয়াদ ৮৩৫
১০· আলী আল হাদী ৮৬৮
১১· হাসান আল আসকারী ৮৭৪
১২· মুহাম্মাদ আল মুনতাজির ৮৭৮

ফাতিমীয় খলিফা

১· উবায়দুল্লাহ আল মাহদী	৯০৯–৯৩৪
২· আল কায়িম	৯৩৪–৯৪৬
৩· আল মনসুর	৯৪৬–৯৫৩
৪· আল মুইজ	৯৫৩–৯৭৫
৫· আল আজিজ	৯৭৫–৯৯৬
৬· আল হাকিম	৯৯৬–১০২১
৭· আল জাহির	১০২১–১০৩৬
৮· আল মুসতানসির	১০৩৬–৯৪
৯· আল মুসতালী	১০৯৪–১১০১
১০· আল আমির	১১০১–১১৩১
১১· আল হাফিজ	১১৩১–১১৪৯
১২· আল জাহির	১১৪৯–১১৫৪
১৩· আল ফাইজ	১১৫৪–১১৬০
১৪· আল আদিদ	১১৬০–১১৭১

www.waytojannah.com

মিশরের শাসন কর্তাবৃন্দ যুগে যুগে

খোলাফায়ে রাশেদীন

খলিফা	শাসনকর্তা
৬৩২ হযরত আবু বকর (রাঃ)	৬৪০ আমর বিন আল আস
৬৩৪ হযরত ওমর (রাঃ)	৬৪৪ আব্দুল্লাহ বিন সাদ
৬৪৪ হযরত উসমান (রাঃ)	৬৫৬ কাসেম বিন সাদ
৬৫৬ হযরত আলী (রাঃ)	৬৫৭–৮ মুহাম্মাদ বিন আবুবকর
	(মালিক বিন হারিস আল আখবার)

উমাইয়া খিলাফাত কালে

৬১১ হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)	৬৫৮ আমর বিন আল আস
	৬৬৪ আব্দুল্লাহ বিন আমর
	৬৬৪ উতবা বিন আবি সুফিয়ান
	৬৬৫ উকবা বিন আমির আল মুহিনী
	৬৬৭ মাসলামা বিন মুখাল্লাদ
৬৮০ ইয়াজিদ	৬৮২ সাঈদ বিন ইয়াসিদ আল আযদী
আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের	
৬৮৩ মারওয়ান বিন হাকাম	৬৮৪ আব্দুর রহমান বিন উতবা কুরাইশী
৬৮৫ আব্দুল মালিক	৬৮৫ আব্দুল আযিয বিন মারওয়ান
৭০৫ আল ওয়ালিদ	৭০৫ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মালিক
	৭০৯ কুররা
৭১৫ সুলাইমান	৭১৪ আব্দুল মালিক বিন রিফাই আল ফাহমী
১৭১ ওমর বিন আব্দুল আজিজ	৭১৭ আইয়ুব বিন সুহরাবীল আল আসবাহী
৭২০ ইয়াসিদ (২য়)	৭২০ বিশর বিন সাফওয়ান আল কালবী
৭২৪ হিশাম	৭২১ হানযালা বিন সাফওয়ান আল ফাহমী
	৭২৪ মুহম্মদ বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান
	৭২৪ আল হুর বিন ইউসুফ
	৭২৭ হাফস বিন ওয়ালিদ আল হাযরামী
	৭২৭ আব্দুল মালিক বিন রিফা
	৭২৭ আল ওয়ালিদ বিন রিফা আল ফাহমী
	৭৩৫ আব্দুর রহমান বিন খালিদ আল ফাহমী
	৭৩৭ হানযালা বিন সাফওয়ান
	৭৪২ হাফস বিন ওয়ালিদ

www.waytojannah.com

৭৪৪ ইয়াযিদ (৩য়)	
৭৪৪ ইবরাহীম	
৭৪৪ মারওয়ান (২য়)	৭৪৫ হাসান বিন আতাহিয়া আল তুযিবী
	৭৪৫ হাফস বিন ওয়ালিদ
	৭৪৫ আল হাওসারা বিন সোহেল আল বাহিলী
	৭৪৯ আল মুযিরা বিন উবাইদুল্লাহ আল শাযারী
	৭৫০ আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান আল লাখমী।

আব্বাসীয় খেলাফত কালে ঃ

৭৫০	আবু আব্বাস আসশাফ ফাহ	৭৫০	সালেহ বিন আলী আল আব্বাসী
		৭৫১	আবু আউন আব্দুল মালিক
		৭৫৩	সালেহ বিন আলী।
৭৫৪	আবু জাফর আল মনসুর	৭৫৪	আবু আউন
		৭৫৮	মুসাবিন কাব আত তামিমী
		৭৫৯	মুহাম্মদ বিন আশ আস আল খুজাই
		৭৬০	হুমায়েদ আল কাতাবা আত তাঈ
		৭৬২	ইয়াযিদ বিন হাতিম আল মুহল্লাবী
		৭৬৯	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন মুয়াবিয়া বিন হুয়াই
		৭৭২	মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান
		৭৭২	মুসাবিন ওয়ালী আল লাখমী
৭৭৫	আল মাহদী	৭৭৮	ইসা বিন লুকমান
		৭৭৯	ওয়াদিহ
		৭৭৯	মনসুর বিন ইয়াজিদ আল রুয়াইনী
		৭৭৯	আবু সালিহ ইয়াহয়া
		৭৮০	সালিম বিন মাওয়াদা আত তামিমী
		৭৮১	ইব্রাহিম বিন সালিহ বিন আলী আসআবী
		৭৮৪	মুসাবিন মুসআব
		৭৮৫	আস আমা বিন আমর
		৭৮৫	আল ফজল বিন সালিহ বিন আলিআল আব্বাসী
৭৮৫	আল হাদী	৭৮৬	আলী বিন সুলাইমান বিন আলী আল আব্বাসী
৭৮৬	হারুন আর রশীদ	৭৮৭	মুসা বিন ঈসা আল আব্বাসী

www.waytojannah.com

Contents

৭৮৯ মাসলামা বিন ইয়াহয়া আল বাজিলী
৭৮৯ মুহাম্মদ বিন জুহির আল আযদী
৭৯০ দাউদ বিন ইয়াযিদ বিন হাতিম আল মুহাল্লাবী
৭৯১ মুসা বিন ঈসা আল আব্বাসী
৭৯২ ইবরাহীম বিন সালিহ আল আব্বাসী
৭৯৩ আব্দুল্লাহ বিন মুস্যাইব
৭৯৪ হারাসামা বিন আইয়ান
৭৯৪ আব্দুল মালিক বিন সালিহ বিন আলী আল আব্বাসী
৭৯৫ উবায়দুল্লাহ বিন মাহদি আল আব্বাসী
৭৯৬ মুসা বিন ঈশা আল আব্বাসী
৭৯৬ উবায়দুল্লাহ আল মাহদী
৭৯৭ ইসমাইল বিন সালিহ বিন আলী আল আব্বাসী
৭৯৮ ইসমাইল বিন ঈসা বিন মুসা আল আব্বাসী
৭৯৯ আল লাইছ আল ফজল
৮০৩ আহমদ বিন ইসমাইল বিন আলী
৮০৫ উবাইদুল্লাহ আল আব্বাসী
৮০৬ আল হোসাইন বিন জামিল
৮০৭ মালিক বিন জিলহিম আল কালবী
৮০৯ আল হাসান বিন তাকতাহ
৮১০ হাতিম বিন হারসামা বিন আইআন
৮১২ জাবির বিন আল আশআম আততাঈ
৮১২ আব্বাদ আল বালখী
৮১৩ আল মুত্তালিব আল খুজাই
৮১৪ আল আব্বাস বিন মুসা
৮১৫ আস সারী বিন আল হাকাম
৮১৬ সুলাইমান বিন গালিব আল বাজিলী
৮১৭ আস সারী
৮২০ মুহম্মদ বিন আসসারী
৮২২ উবায়দুল্লাহ আসসারী
৮২৬ আব্দুল্লাহ বিন তাহির
৮২৭ আই–আ বিন ইয়াজিদ আল যালুদী
৮২৯ উমায়ের বিন ওয়াযেদ
৮২৯ আল মুতাসিম আল আব্বাসী
৮৩০ আব দাযীই বিন জিবিলাহ

www.waytojannah.com

	৮৩১ ইশা বিন মানসুর
	৮৩২ আল মামুন
	৮৩২ নসর বিন্ আব্দুল্লাহ
৮৩৩ আল মুতাসিম	৮৩৪ আল মুজাফফর বিন কাইদার
	৮৩৪ মুসা আল হানাফী
	৮৩৯ মালিক বিন কাইদার
	৮৪১ আলি বিন ইয়াহয়া আল আরমেনী
৮৪২ আল ওয়াসিক	৮৪৩ ঈসা বিন মনসুর
৮৪৭ আল মুতা ওয়াক্কীল	৮৪৭ হারসামা বিন নযর
	৮৪৯ হাতিম বিন হারসামা
	৮৪৯ আলী বিন ইয়াহয়া
	৮৫০ ইস্হাক বিন ইয়াহয়া
	৮৫১ আব্দুল ওয়াহিদ বিন ইয়াহয়া
	৮৫২ আনবাসা বিন ইসাহক
	৮৫৬ ইয়াযিদ বিন আব্দুল্লাহ আত্তুতরমী
৮৬১ আল মুনতাসির	
৮৬২ আল মুসতাইন	
৮৬৬ আল মু'তাজ	৮৬৭ মুযাহিম বিন খাকান
	৮৬৮ আহমদ বিন মুযাহিম
৮৬৯ আল মুহতাদ	৮৬৮ আর গুজ তারখান
৮৭০ আল মুতামিদ	৮৬৮ আহমদ বিন তুলুন (তুলুনীয় শাসণকর্তা)
	৮৮৪ আবুল গিয়াস খুমারাবিয়াহ
৮৯২ আল মুতাজিদ	৮৯৬ আবুল আসাকির গিয়াস
	৮৯৬ আবু মুসা হারুন
	৯০৪ শাইবান বিন আহমদ
	৯০৫ মুহাম্মাদ আল খালাহ
	৯০৫ ঈশা বিন মুহাম্মাদ আল নুমাইরী
৯০৭ আল মুকতাদির	৯০১ তেকিন আল খাসমা
	৯১৫ যুকা আর রুমী
	৯১৯ তেকিন (২য় বার)
	৯২১ মুহম্মদ বিন হামাল
	৯২১ তেকিন (৩য় বার)
	৯২১ হিলাল বিন বদর
	৯২৩ আহম্মদ বিন কাইঘালাঘ
	৯২৪ তেকিন (৪র্থ বার)
৯৩২ আল কাহির	৯৩৩ মুহম্মদ বিন তেকিন
	৯৩৩ মুহম্মদ বিন তুঘুজ

www.waytojannah.com

৯৩৩ আর রাজি	৯৩৩ আহমদ বিন্ কাইঘালাঘ
	৯৩৪ মুহাম্মদ বিন তেকিন
	৯৩৫ ইখশিদ

ইখশীদীয় শাসনকর্তা

৯৪০ আবুল ইসাহক ইবরাহীম আল মুতাফকী বিল্লাহ	৯৩৫–৪৬ মুহম্মাদ নি তুঘুজ ইখশীদ
	৯৪৬–৬১ আবুল কাশেম আনজের
৯৪৪ মুসতাকফী	৯৬১–৬৪ আবুল হাসান আলী
৯৪৬ আল মুতীত	৯৬৪–৬৮ আবুল মিসক কাফুর
৯৭৪ আল তাই বিল্লাহ	৯৬৮–৯৬৯ আবুল ফাওয়ারিম আহমদ

www.waytojannah.com

গ্রন্থপঞ্জী

1. DE LACY O'LEARY DD. : A Short History of the Fatimied Khalifate London 1923
2. STANELY LANE POOLE : A History of Egypt under the Saracens
3. P. Mamour : Polemies on the origin of the Fatimi Calipha London, 1934
4. B Lewis : Origin of Islmailism Cambridge, 1939
5. I Vanow : Rise of the Fatimid Caliph Cairo-1958
6. Dr. Zahid Ali : Tarikhe Fatimiyian, Hyderabad-1948.
7. H. Hamdani : Genealogy of Fatimid Calph Cairo 058
8. A. Fyzee : Qadin-Nuaman. The Fatimid Jurist and author.
9. A. R. Guest : Governors and judges of Egypt London 1912
10. J. Mann : The jews in Egypt and Palestine under the Fatimid Caliphs. Oxford 1920-22.
11. Heyd : Histire du Commerce du levad am Moyen Age. Lerpzig 1885.
12. K.A.C. Creswell : A Short account of the early Muslim Archi tecture.
13. L amm : Fatimid wood work. its Style and Chronology Cairo 1936
14. W. Lvanow : Guide to Ismaili Literaturs London 1932
15. Ibn Khallikan Shamsuddin Abul Abbas : Wafiat Ul Aiyan
16. Maqrizi Ahmed bin Ali Bin Abdul Qadir al Maqrizi : খিতাত
17. Ibn Khaldun : Kitabul Iber
18. Ameer Ali Sayeed : A short History of the Saracens
19. Hitti Pk. : History of the Arabs Hamdani
20. Dr. Abbas Aacudamui : The Fatimids. Karachi 1962

www.waytojannah.com

Contents

উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতিমীয়দের ইতিহাস □ এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

www.waytojannah.com